

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-১: ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ

প্রশ্ন ১ উপনিবেশিক শাসন ও নির্যাতনের যাতাকলে নিম্নে ফিত 'M' রাষ্ট্রের জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে চলেছে। গণআন্দোলনে বাধ্য হয়ে শাসকগোষ্ঠী একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রকে দুর্ভাগে ভাগ করে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে দেশ ত্যাগ করে।

/সকল বোর্ড ২০১৮/ প্রশ্ন নং ৩/

- ক. মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা কতজন? ১
 খ. বঙ্গভঙ্গ বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্বীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো আইনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা ও জন।

খ বঙ্গভঙ্গ বলতে ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ২ ভাগে বিভক্ত করাকে বোঝায়।

প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের বাংলা প্রেসিডেন্সিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম এবং বাংলা প্রদেশ নামে ২টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের তদনীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। যা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

গ উদ্বীপকে প্রণীত আইনের সাথে আমার পঠিত ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতবর্ষের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের এক পর্যায়ে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে গণআন্দোলন শুরু করে। তাহাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পরম্পর বিরোধী দাবির প্রক্রিয়ে ব্রিটিশ সরকার মহাসমস্যায় পড়ে। ভারতের এই রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক অচলাবস্থা দূর করার লক্ষ্যে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটি কার্যকর করার লক্ষ্যে ৪ জুলাই ব্রিটিশ পালামেটে তিনি একটি বিল উত্থাপন করেন। এ বিলে ব্রিটিশ ভারতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এটিই ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে ব্যাপ্ত।

উদ্বীপকের 'M' রাষ্ট্রের জনগণ উপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে চলেছে। তাদের গণআন্দোলনে বাধ্য হয়ে শাসকগোষ্ঠী একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। শাসকগোষ্ঠীর প্রণীত নতুন আইন অনুযায়ী জন্ম হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে। এ আইনের সাথে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ

আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দূরীভূত হয়।

দীর্ঘ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা হয়। এজন্য এ আইন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দলিল। উক্ত আইন প্রণয়নের ফলে এ উপমহাদেশে রক্তপাতাইন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদিতে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। নতুন প্রেরণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুটি স্বাধীন দেশের জনগণ নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থিতির ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ২ 'গ' একজন রাজনৈতিক নেতা। মানবতার কল্যাণ তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। /সকল বোর্ড ২০১৮/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কখন? ১
 খ. 'হিজাতি তত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্বীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল- বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ 'হিজাতি তত্ত্ব' হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠের একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

মোহাম্মদ আলী জিনাহ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি ব্রহ্ম আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে 'হিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক বীভাতি, জীবন পরিচালনা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি ব্রহ্ম অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে তারা পৃথক দুটি জাতি। তার এই মতবাদটি 'হিজাতি তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

ঘ উদ্বীপকে আলোচিত প্রস্তাবের সাথে আমার পঠিত লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে বাংলার তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য ব্রহ্ম আবাসভূমির দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে তৎকালীন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোর সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত

অধিকার রক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়। এ প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম রাজনীতিতে ইতিবাচক সাড়া জাগে এবং মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত অর্জন করে।

উদ্দীপকের 'গ' একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কথা চিন্তা করে তাঁর অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উন্নাপিত লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্তর হয়।

ব উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রস্তাবের মধ্যে অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল- আমি এ উক্তিটিকে যথার্থ মনে করি। উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উন্নাপিত লাহোর প্রস্তাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। যে রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে উন্নিষিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের বিষয়টি এভিয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) প্রতি চৰম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের জোর দাবি জানায়।

১৯৫৪ সালের মুক্তফাটের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যর্থনা সরকারিই ছিল লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী সীগের বিজয় হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে অবীকৃতি জানায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে পূর্ববাংলায় শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যন্তর্যামী ঘটে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত রয়েছে।

অন্তর্বর্তীন প্রশ্ন **৩** ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৮৮৫ সালে 'সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশে একটি রাজনৈতিক দলের উত্তর ঘটে। মুসলমানগণও তাদের স্বার্থ এবং দাবি-দাওয়া পূরণের উদ্দেশ্যে আরো একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দল দুটি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখায়। পরবর্তীতে দল দুটির নেতৃত্বে ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

জন বোঁ ১৭। গ্রন্থ নং ১।

- ক. ছি-জাতি তত্ত্বের প্রবন্ধ কে? ১
খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়েছে? যেকোনো একটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. ভারত বিভক্তিতে উক্ত দল দুটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছি-জাতি তত্ত্বের প্রবন্ধ হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে প্রদেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। এতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমত, সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, অধীনেতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশ আঞ্চনিকভাবে রাখিব। মোটকথা, প্রদেশগুলোর সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বশীল হওয়াই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন।

গ উদ্দীপকে 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগ' নামে ব্রিটিশ ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৮৫ সালের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। দলটির সদস্যপদ হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্নেষ্ট ঘটে এবং ইংরেজ শাসকদের কাছে দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে মুসলমানরা নিজেদের একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনে উন্মুক্ত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের নিজস্ব দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ দলটি গঠিত হয়েছিল। যথা:

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য প্রদর্শন এবং সরকারের কোনো নীতি সম্পর্কে তাদের মনে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।
২. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া গঠনমূলকভাবে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা।
৩. এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যেন কোনো বিষেষভাব না জাগে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. রাজনীতিতে কংগ্রেসের একজুত্র আধিপত্য ঘৰ্ব করা।

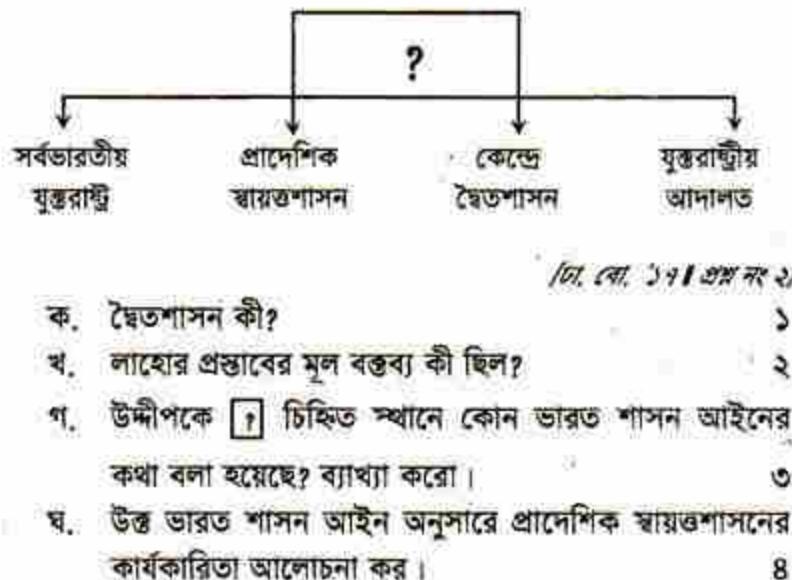
ঘ ভারত বিভক্তিতে উক্ত দল দুটি অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির সদস্যপদ হিন্দু-মুসলিমসহ সব ভারতীয়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের কিছু সিদ্ধান্তে মুসলমানরা ভিন্নমত পোষণ করে এবং তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। তুলনামূলকভাবে অন্যসর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় ও অগ্রগতির লক্ষ্যে মুসলিম নেতারা কংগ্রেসের প্রতি হতাশা থেকে ১৯০৬ সালে পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয় কংগ্রেস দল ভারতীয়দের অধিকার আদায়ে নানামূর্চী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ফলে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। প্রথমদিকে কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিয়ে দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করে। তবে পরে এ সংগঠনটি ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

অন্যদিকে বিংশ শতকের শুরুর দিকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সাংগঠনিক ভিত্তি থাকায় মুসলমানদের ন্যায়সংজ্ঞাত দাবি আদায় সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থসংকল্পিত বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বাড়তে থাকে। গঠনের পরবর্তী ৪০ বছরে (স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত) মুসলমানদের মধ্যে দলটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদিকে ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' (ভিভাইড অ্যান্ড বুল) নীতিসহ বিভিন্ন কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। এমন প্রেক্ষাপটে বিংশ শতকের চারিশের দশকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'ছি-জাতি তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। এতে মুসলিমদের পৃথক জাতি হিসেবে উল্লেখ করে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতবাসীর মনে স্বাধিকারের চেতনার জন্ম দিয়েছিল। কিছু চেষ্টা সংলগ্ন দুই দলের নেতাদের মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত দূর করা সম্ভব না হওয়ায় ভারত অনিবার্যভাবে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তির পথে এগিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৪ ছক্টি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



জ. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ২/

- ক. হৈতশাসন কী? ১
 খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কী ছিল? ২
 গ. উদ্দীপকে ? চিহ্নিত স্থানে কোন ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উক্ত ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা আলোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে হৈতশাসন বলে।

খ লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা।
 লাহোর প্রস্তাবের ধারাগুলো বিবেচনা করলে এর কিছু মৌলিক দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন : ১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ২. ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন এবং এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রদেশগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। ৩. সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ। ৪. লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে দেশের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতাত্ত্বিক ইতিহাসে পুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ আইনের বলেই ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। উদ্দীপকটি এই আইনের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্র হৈতশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কথা বলা হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও এ বিষয়গুলোর উল্লেখ আছে। এ আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরিকল্পনা ও গৃহীত হয়। এতে বলা হয়- প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশ আঞ্চনিকরূপী হবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্র হৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহকে সংরক্ষিত এবং হস্তান্তরিত এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আলোচ্য আইনটির মাধ্যমে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিরোধ শীমাংসা করা। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, উদ্দীপকটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকেই নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আইন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিভিন্ন কারণে অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতাত্ত্বিক অগ্রগতি ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এ আইন প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল। তবুও এ আইন বিভিন্ন মহলে বহুলভাবে সমালোচিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও বিভিন্ন কারণে তা যথার্থ ছিল না। তাই স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতার পথে ওই কারণগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নরগণ ছিলেন প্রকৃত শাসক। তারা ব্রিটিশ রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সীমান্তীন ক্ষমতা লাভ করতেন। তাদের এই ক্ষমতা এবং তার অপব্যবহার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক ধারণার সাথে অসংগতিপূর্ণ ছিল। গভর্নর জেনারেলেরও ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক নীতিকে বর্বর করেছিল। এছাড়া প্রাদেশিক আইনসভার সীমাবদ্ধতা, যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য, আমলা, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দৌরান্ত্য, গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ, প্রাদেশিক বিষয়ে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা কোনো দিনই কার্যকর হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক প্রশাসনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হলেও এটি কোনো প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ছিল না। মূলত এ শাসন ব্যবস্থা ছিল একটা আড়ম্বরপূর্ণ প্রহসনমূলক। ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তার মৌলিকতা হারিয়ে এক বিকৃত ব্যবস্থার পরিগত হয়েছিল।

প্রশ্ন ৫ নাগরিকদের অধিকরণ সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুইভাগে ভাগ করে 'ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন' ও 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন' নামে পৃথক দুটি সিটি কর্পোরেশনে বৃপ্তান্ত্বিত করে।

জ. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ২/ নায়ক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। গ্রন্থ নং ২/

১. বজ্রভঙ্গ কী?
 ২. হৈতশাসন বলতে কী বোঝায়?
 ৩. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো।
 ৪. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে মস্যাং করা— বিশ্লেষণ করো।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে বঙাদেশকে(প্রদেশ) বিভাজন করাই হলো বজ্রভঙ্গ।

খ ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার শাসনভাব সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে নাস্ত করাই হলো হৈতশাসন।

৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) পর লঙ্ঘ ক্লাইভ বাংলায় হৈতশাসন প্রবর্তন করেন। হৈতশাসনের অর্থ হলো দুজনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শাস্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নামেমাত্র নবাবের হাতে। অনাদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি ও জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার ইত্যাদি লাভজনক কাজ কোম্পানি নিজের হাতে রাখে। বলা হয়, হৈতশাসন ব্যবস্থায় ইন্টাইন্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর অন্যাদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গু. উদ্বীপকের সাথে আমার পঠিত ইতিহাসিক ঘটনা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য আছে।

বঙ্গভঙ্গ ভিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ভিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি প্রশাসনিক বোৰ্ড লাঘব করে। তাছাড়া এটি নবগঠিত পূর্ববঙ্গের অধিনাত্ত ও জীবনমান উন্নয়নে নতুন যুগের সূচনা করে। উদ্বীপকে বর্ণিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দু'ভাগে ভাগ হওয়ার সাথে বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য আছে।

ভিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ ছিল আয়তনে ও জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড়। একজন গভর্নর জেনারেলের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (George Nathaniel Curzon; 1859-1925) ভারত সচিবকে লিখেছিলেন যে, একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে এত বড় ও জনবহুল এলাকা শাসন করা সম্ভব নয়। তার এ লিখিত রিপোর্টের আলোকেই ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশটি গঠিত হয় পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা, রাজশাহী(দার্জিলিং বাদে), চট্টগ্রাম ও আসাম নিয়ে। এর নাম হয় 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ। ঢাকাকে এ নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উত্তরব্যায় নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ; কলকাতা হয় এর রাজধানী।

উদ্বীপকে আমরা দেখতে পাই, নাগরিকদের অধিকতর সেবা দেওয়ার জন্য সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দু'ভাগে ভাগ করে। এর একটি হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; যা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ঘটনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

গু. উদ্বীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাং করা— এ বক্তব্যটি যথার্থ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক, অধিনাত্ত ও সামাজিক কারণ থাকলেও এর অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাং করা। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়রা নিজেদের অধিকারের বিষয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে 'যুগান্তর দল' এবং 'অনুশীলন সমিতি' নামে দুটি অতি বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। এসব আন্দোলনে ভূত হয়ে ভিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত শাসন কৌশল 'ভাগ কর এবং শাসন কর নীতি' (Divide & Rule Policy) প্রয়োগ করে। বাংলা তথা বঙ্গপ্রদেশকে বিভক্ত করে ভিটিশের এ দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে তাদের শাসনকে দীর্ঘায়িত করার কৌশল গ্রহণ করে। এছাড়া ঢাকার নবাব স্বার সলিমুল্লাহ ও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে জনগণকে বোৰ্ডে চেষ্টা করেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সুযোগ পাবে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃদের মধ্যে ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে। শিক্ষিত হিন্দু সমাজ মনে করে, তাদের দ্রুত বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে ব্যাহত করা এবং এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ব বাংলার মুসলিম প্রভাব বাড়ানোকে উৎসাহিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আবার বাংলার অধিকাংশ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতে, তাই বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এভাবেই বঙ্গভঙ্গের দ্বারা ভিটিশ শাসকগণ কৌশলে কলকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাং করার সুযোগ লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রশাসনিক কাজ সহজতর করার পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ভিটিশের 'ভাগ কর ও শাসন কর' কৌশল সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের থেকে আলাদা করে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার অনেক চারতে তাদের শাসনকে আরো শক্তি যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ৬ 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে দুভাগ করে সংরক্ষিত বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয় নামে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংরক্ষিত বিষয়গুলো গভর্নর তার হাতে রাখেন।

- | | |
|---|---|
| ক. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কী? | ১ |
| খ. লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশে প্রবর্তিত আইনের সাথে তোমার পঠিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্বীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিটিশ ভারতে সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ভারত সচিব জন মর্লে ও গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে ১৯০৯ সালে যে সংস্কার আইন পাস করা হয়, তাই মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন নামে পরিচিত।

খ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনাই হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে মুহাম্মদ আলী জিনাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। বস্তুতপক্ষে, ভারতের মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত পার্থক্যের ফল ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশে প্রবর্তিত ব্যবস্থার সাথে আমার পঠিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রদেশে হৈতে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা ভিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে হৈতে শাসন প্রবর্তন করা হয়। এটি ভারতের শাসনতাত্ত্বিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। সাধারণত হৈতে শাসন বলতে কোনো প্রশাসনে দুটি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিকে বোঝায়। এমন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিষয়কে দুভাগে ভাগ করা হয় এবং পরিচালনার জন্য দুই ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দুভাগে ভাগ করা হয়। বিচার বিভাগ, ভূমিরাজস্ব, পুলিশ, জেল, ভূমি উন্নয়ন ও কৃষিকল, ত্রাণ, সেচ, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ, বনজগন্ধি, বিমা, গৃহ নির্মাণ, অগদান, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, খাল খনন, বাধ নির্মাণ প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয় হিসেবে পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর ও তার কার্যনির্বাহী পরিষদের ওপর ন্যস্ত হয়। অপরদিকে কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, মৎস্য, স্থানীয় সরকার, জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে পরিচালনার ভার গভর্নর ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত হয়। প্রাদেশিক গভর্নর হস্তান্তরিত বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হতেন। উদ্বীপকের 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশগুলোতে আমরা দেখতে পাই, প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে দুভাগ করে সংরক্ষিত বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয় নামে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সংরক্ষিত বিষয়সমূহ গভর্নর তার হাতে রাখেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্বীপকের রাষ্ট্রের আইন আমার পঠিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭. উদ্বীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকারিতার দিক দিয়ে বার্থ হলেও ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের দিক দিয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম উল্লেখ্য ছিল ধাপে ধাপে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। কেননা, এ আইনে গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিষ্ঠিত। প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে দৃটি সংস্থায় বা দুভাগে বিভক্ত করায় সরকারের স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ বিষ্টিত হয়ে প্রস্তুত হয়।

যেকোনো দেশে দলব্যবস্থা সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু প্রদেশে বৈতান শাসন কার্যকর করার সময় এমন দলব্যবস্থা ছিল না। মন্ত্রীগণ যৌথভাবে নিযুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত হন এবং সরকারি সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল থাকতেন। তাছাড়া মন্ত্রিসভার দায়িত্বহীনতা, সংসদীয় প্রতিহের অভাব, বিষয় বিটনের তুচি, মন্ত্রিসভা ও কার্যনির্বাচী পরিষদের মধ্যে ক্ষমতার ছন্দ, সাম্প্রদায়িক বিষয়ে গ্রস্তি কারণে ১৯১৯ সালের আইনটি কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইনটির মাধ্যমে কেন্দ্র দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয়নি। তাই এ আইন ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো এ আইনকে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যজনক বলে ঘোষণা করে এবং প্রত্যাখ্যান করে।

৮. স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় বার্থ হওয়ায় এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে জনগণ শীত্বাই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিরোধিতা শুরু করে। তবে সাংবিধানিক সংস্কারের দিক বিবেচনায় এ আইনকে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৭. প্রশাসনিক সুবিধার্থে 'ক' অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অবশ্য এর পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

দিন/লে: ১৭/ প্রশ্ন নং: ১

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত সালে গঠিত হয়? | ১ |
| খ. | বেঙ্গল প্যাট বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. | উদ্বীপকের ঘটনাটি ত্রিপুরা ভারতের কোন ঘটনার সাথে সামঝস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. | উক্ত ঘটনাটি ভারতবর্ষের রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? আলোচনা করো। | ৪ |

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ. ত্রিপুরা আমলে বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাট।

ত্রিপুরা শাসনের অধীনে বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগই ছিল মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অশিক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্য খ্যাত নেতৃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এ বৈষম্য দূর করতে বেঙ্গল প্যাট এর উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। তার অন্তর্গত প্রচেষ্টায় এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ানীসহ বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাট সম্পাদিত হয়। অন্তর্দেশ মুসলিমদের কিছু বাড়ি সুবিধা দিয়ে সরকারি চাকরি ও আইন পরিষদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য।

গ. উদ্বীপকের ঘটনাটি ত্রিপুরা ভারতের ঐতিহাসিক বজ্রাঙ্গের সাথে সামঝস্যপূর্ণ।

ত্রিপুরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বজ্রাঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড কার্জনের শাসনামলে বজ্রাঙ্গে সংঘটিত হয়। এ ঘটনার পেছনে যে কারণগুলো নিহিত ছিল, উদ্বীপকের 'ক' অঞ্চলটি ভাগের ক্ষেত্রেও সেগুলো লক্ষণীয়।

উদ্বীপকের 'ক' অঞ্চলটি প্রশাসনিক কারণে ভাগ করা হয়েছিল। তবে এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। বজ্রাঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমনটিই দেখা যায়। ১৯০৫ সালের আগে ত্রিপুরা ভারতে অবিভক্ত বজ্রাঙ্গে ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। তাই প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বজ্রাঙ্গে করা হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কলকাতা নগরই ছিল ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী এবং বাংলা প্রদেশের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ দিনে দিনে পিছিয়ে পড়েছিল। শিক্ষার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে অন্তর্গত পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল চৰম হতাশা। তাই উন্নয়ন ও অধিকার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের দাবি পূরণ এবং একইসঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রিক ত্রিপুরাবরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাং করার জন্য লর্ড কার্জন বজ্রাঙ্গের সিন্ধান্ত নেন। আর্থাৎ শুধু প্রশাসনিক কারণই নয়, ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভক্ত করার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল। বজ্রাঙ্গের উল্লিখিত কারণগুলো উদ্বীপকের 'ক' অঞ্চলের বিভক্তিকরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. ত্রিপুরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উদ্বীপকের উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ ১৯০৫ সালের বজ্রাঙ্গে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বজ্রাঙ্গের ফলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অন্তর্গত মুসলমানরা মনে করেছিল বজ্রাঙ্গে হয়ে নৃতন প্রদেশ হলে শিক্ষাদীক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়ন হবে এবং দীর্ঘদিনের অবহেলা ও বঞ্চনার অবসান ঘটবে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় বজ্রাঙ্গের ঘটনাকে বাঞ্ছলি জাতির বিকাশমান সংহতি ও চেতনার ওপর আঘাত হিসেবে দেখে। পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ হওয়ায় পূর্ববঙ্গের ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠে। তবে পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়, বিশেষ করে ধনাড় ভূঁঝামীরা বজ্রাঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই সম্প্রদায়ের ওপর বজ্রাঙ্গের এই বিপরীতধর্মী প্রভাবের ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়ক রোপিত হয়। হিন্দুরা বজ্রাঙ্গে রদের জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করে।

আপাতদৃষ্টিতে, বজ্রাঙ্গে মুসলিমদের অনুকূলে একটি প্রশাসনিক উদ্যোগ হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ত্রিপুরার বড় একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। বজ্রাঙ্গে ছিল তাদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নামে পরিচিত কূটকৌশলের অংশ। বাংলা প্রদেশকে ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার কৌশলে কলকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাং করার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া এর ফলে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতার বোধ ও কট্টরপন্থার জন্ম হয়। এটি বাংলার দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পরিশেষে বলা যায়, বজ্রাঙ্গে বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভক্তি উসকে দেয়। এমনকি বজ্রাঙ্গে রদের পরেও, রাজনীতি এবং অধিকার আদায়ের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের কোনো ঐক্য আর গড়ে উঠেনি।

ঘ. ▶ ৮. রফিকের দেশে রাষ্ট্রীয় কার্যবলিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সরকার তার ওপর অর্পিত কার্যবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রাধান্য বিদ্যমান।

- | | | | |
|--------------------------|----|---|---|
| দিন/লে: ১৭/ প্রশ্ন নং: ৮ | ক. | ত্রিপুরা ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? | ১ |
| | খ. | বৈতান বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| | গ. | উদ্বীপকের বজ্রাঙ্গে ত্রিপুরা ভারতের কোন ধরনের জন্য আয়তন আছে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| | ঘ. | উদ্বীপকে বর্ণিত আইনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

খ সৃজনশীল ৫নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্বীপকে বর্ণিত শাসন ব্যবস্থা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। ব্রিটিশ ভারতের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এ ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

ভারতের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উল্লেখ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যর্থতার ফলশ্রুতিই হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইনেই উদ্বীপকে ইঞ্জিতকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

উদ্বীপকে রফিকের দেশে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবে তার কাজ করতে পারবে। এখানে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রাধান্য বিদ্যমান। এছাড়া দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষ প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তুতিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এ আইনের বলে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রদেশগুলো সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা লাভ করে এবং প্রাদেশিক সরকার দায়িত্বশীল হয়। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বত্ত্বকে প্রমুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে উচ্চ পরিষদ ও নিম্নপরিষদ নামে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হয়। এ আইনসভায় উচ্চ পরিষদ কর্তৃক প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি জটিল আইন। তবে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্বীপকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ইঞ্জিত বিদ্যমান।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন **১** বিশাল আয়তনে গঠিত অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন জনাব ইসমাইল। তাঁর একার পক্ষে বিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা স্বীকৃত করা কঠিন হচ্ছিল। এর ফলে কর্তৃপক্ষ বিশাল অঞ্চল 'ক' ও 'খ' অঞ্চলে বিভক্ত করে। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ খুশি হলেও 'খ' অঞ্চলের জনগণ তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে দুই অঞ্চলকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়। *ব্রিটিশ সরকার কর্তৃত প্রশ্ন নং ১১, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃত প্রশ্ন নং ১০*

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? **১**

খ. মুসলিম লীগ কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? **২**

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। **৩**

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ 'ক' অঞ্চলের জনজীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল তা বিশ্লেষণ করো। **৪**

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে প্রাদেশিক বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্বকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে।

খ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক বিষয়ে এক্যুবস্থি ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদিক হতে অবহেলিত ও বিষ্ণুত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও এটি অবহেলিত ও বিষ্ণুত মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানদের এ অবহেলিত ও হীন অবস্থা হতে উদ্ধারকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতির সার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ধারক ও বাহক হিসেবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভক্তির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ১৯০৫ সালের বজ্ঞানজ্ঞের মিল রয়েছে।

১৯০৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশেই ছিল আয়তনে এবং জনসংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল, এবং সোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা ছিল খুবই কষ্টকর। তাই এ প্রদেশকে ভেঙে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যা উদ্বীপকেও সংক্ষণীয়। উদ্বীপকে দেখা যায়, জনাব ইসমাইল তার অধীনে বিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অঞ্চলটিকে 'ক' ও 'খ' অঞ্চলে বিভক্ত করে। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ খুশি হলেও 'খ' অঞ্চলের জনগণ তীব্র বিরোধিতা করে। এ ঘটনা মূলত বজ্ঞানজ্ঞকেই নির্দেশ করে। বৃহৎ আয়তন ও বিশাল জনসংখ্যার বজ্ঞান প্রদেশকে একজন ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে শাসন করা দুরহ ছিল। তাই ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বজ্ঞানজ্ঞ পরিকল্পনা অনুযায়ী 'পূর্ব বাংলা' ও 'আসাম নামে' একটি প্রদেশ এবং 'পশ্চিম বাংলা' নামে অন্য একটি প্রদেশ গঠিত হয়। বজ্ঞান প্রদেশকে দুই প্রদেশে বিভক্ত করার কারণে মুসলমানরা খুশি হলেও ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ অনেক অসন্তুষ্ট হয়। বজ্ঞানজ্ঞকে রাদ করার জন্য হিন্দুরা আন্দোলন শুরু করে। এর এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বজ্ঞানজ্ঞকে রাদ করে। আর উদ্বীপকেও এ ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ অর্থাৎ বজ্ঞানজ্ঞ 'ক' অঞ্চলের তথা পূর্ব বাংলার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

উদ্বীপকের বিশাল অঞ্চলের বিভক্তিকরণ ব্রিটিশ ভারতের বজ্ঞানজ্ঞকে নির্দেশ করে। আর 'ক' অঞ্চল দিয়ে পূর্ব বাংলাকে বোঝানো হয়েছে। বজ্ঞানজ্ঞের ফলে পূর্ব বাংলার জনজীবনে যে প্রভাব পড়েছিল উদ্বীপকের 'ক' অঞ্চলের জনগণের জীবনেও একই ধরনের প্রভাব পড়বে।

পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বজ্ঞানজ্ঞ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এর ফলে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিম সমাজের রাজনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নতুন প্রদেশের প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্বীপনা দেখা যায়। বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বজ্ঞানজ্ঞের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় নতুন নতুন সুরম্য আট্টলিকা, হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট, আইন পরিষদ ভবন, কার্জন হল প্রতিতি নির্মিত হতে থাকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও অগ্রগতি অর্জিত হয়। এছাড়া ঢাকা নগরের পুর্বজামা ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি ত্বরিত হয়। পূর্ব বাংলায় রেল লাইনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। লর্ড কার্জন স্বয়ং আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রদেশ উন্নত কৃষি ও প্রতিশ্য বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ববঙ্গ শাসনব্যবস্থায় ঘোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বজ্ঞানজ্ঞের ফলে পূর্ববঙ্গের জনজীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। অনুরপতাবে উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ 'ক' অঞ্চলের জনজীবনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ উপমহাদেশের শাসনের এক পর্যায়ে ব্রিটিশরা ভারত শাসন আইন নামে একটি আইন তৈরি করে। উক্ত আইনে সর্বপ্রথম ভারতের প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়। এই আইনে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও দুটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এই আইনের ধারাবাহিকতায় এক সময় ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়।

প্রশ্ন বোর্ড নং ১/ গ্রন্থ নং ১/

- ক. বৈতশাসন কাকে বলে? ১
খ. কেন ব্রিটিশ সরকার 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি গ্রহণ করেছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আইনের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এই আইনের ধারাবাহিকতায় ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

বি. ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রুবাট ক্লাইভ যে অভিনব শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাকে বৈতশাসন বলে।

বি. ভারত উপমহাদেশে বসবাসরত প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হন্দু তৈরি করে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্যই ব্রিটিশরা 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের শাসননীতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল— হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নানা হন্দু-সংঘাত সৃষ্টি করে নিজেদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী করা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের গৃহীত বজ্ঞানতা এর প্রকৃত উদাহরণ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক অগ্রগতির ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া, সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং নতুন প্রদেশ গঠন করার মাধ্যমে এ আইন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

উদ্দীপকে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত একটি আইনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন, দুটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এগুলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ আইন গৃহীত হয়। এ আইনে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশ ও ফেডারেশনে যোগদানে ইচ্ছুক দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারেই পূর্ণ কর্তৃত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আবার এ আইনে ব্রহ্মদেশকে (বার্মা) পৃথক করে উড়িষ্যা ও সিন্ধু নামে দুটি আলাদা(নতুন) প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্নয়ন ঘটায়। ফলে তারা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরেই ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে হিন্দু-মুসলিম উভয়ই আলাদা জাতি, আর এ নীতি পাকিস্তান-ভারত নামক আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পথ তৈরি করে দেয়।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে তারা হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেসের আচরণ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। জিনাহর স্থিতি তত্ত্বের (হিন্দু-মুসলিম আলাদাজাতি) ভিত্তিতে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে উভয় সম্প্রদায় আলাদাভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৪৬ সালে মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম এক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। তাছাড়া মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে যায়। তারপরও তারা পরিকল্পনার প্রতি নমনীয় থেকে অন্তর্বৰ্তীকালীন সরকারে যোগদানের ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনায় তাদের স্বার্থগত বিষয়গুলোকে সমর্থন দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে নানা বিবোধ, হন্দু-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়ে মতান্বেক্য দেখা দেওয়ায় শাসনব্যবস্থার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে হিন্দু-মুসলিম দাজ্জা চৰম আকার ধারণ করলে তা দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রস্তর বিরোধী ভূমিকার কারণে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়। ফলে জন্ম নেয় ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি স্বাধীনতার দাবিতে রূপ লাভ করে। ফলে নানা ধারাবাহিক ঘটনার প্রেক্ষিতে জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ▶ ১১ দক্ষিণ আফ্রিকা এমন একটি দেশ যেখানে বিদেশি শাসক দীর্ঘদিন শাসন করেছে। মেলসন ম্যাডেলার নেতৃত্বে সেখানকার কৃষ্ণজগত জনগণ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে।

- ক. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল? ১
খ. ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় প্রাদেশিক শাসন কীরুপ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে কোন ঘটনার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রক্ষাপটে উক্ত ঘটনার পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

বি. ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল।

বি. ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারত শাসন আইনে ভারতের প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। এতে বলা হয়, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে প্রদেশগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। দায়িত্বশীলরা তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর অনুগত প্রাদেশিক গভর্নর প্রদেশে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তাই বলা যায় যে, ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় প্রাদেশিক শাসন ছিল অনেকটা নামমাত্র ও অর্থহীন।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন বিদেশি অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ নিরবে এ প্রাধীনতাকে মেনে নেয়নি। দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়ে একসময় তারা স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষ তাদের স্বাধীনতা হারায়। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি নানা কৌশল ও

বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে তাদের কর্তৃতু প্রতিষ্ঠা করে। তারা কালক্রমে পুরো ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মাইলফলক। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে পাক্ষিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে এবং তারা স্বাধীনতার দাবিতে সংগঠিত হতে থাকে। উপমহাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাজ্ঞা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিনাহ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভূমিকা পালন করেন। তাদের আন্দোলনের মুখ্য ত্রিচিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদান করে। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন বিদেশি শাসন কার্যকর ছিল। নেলসন ম্যাঙ্কেলার নেতৃত্বে সেবানকার কৃষ্ণজগ জনগণ দীর্ঘ সংগ্রামের পর নায় অধিকার লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৫ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উক্ত ঘটনা অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিণতি ছিল অত্যন্ত সুন্দরপ্রসারী।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সাধারণত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্যগুলো পাকিস্তানের এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গরাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে দুটি রাষ্ট্র নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে একটি পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের স্বারা নানাভাবে বিশেষ করে অধিনেতৃত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে।

১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর মূল প্রস্তাবই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম সীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং ব্যাপক সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

এভাবে লাহোর প্রস্তাবকে এড়িয়ে যাওয়া এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা না করায় এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ত্রিতীয় স্বীকৃতি ছিল, তথাপি অনেকেই মনে করেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তথা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিণতিই হলো আজকের বাংলাদেশ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রাপ্তি ১ আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি প্রধান সম্প্রদায় বসবাস করে। এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশি শাসন বিদ্যমান থাকায় দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে হন্ত-সংঘাত লেগেই থাকে। শাস্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলেও তা সমাধান হয়নি। পরিশেষে, কর্তৃপক্ষ দু'সম্প্রদায়কে আলাদা করার চিন্তা করে এবং পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করে। এ আইন অনুযায়ী দু'সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

১/ বো. ১৭। প্রপ. নং ১। বালকাটি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রপ. নং ১।

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

খ. হৈদেত শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সাথে তোমার পঠিত কোন আইনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আলান অস্টোডিয়ান হিউম।

ব সূজনশীল ৫২ং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সাথে আমার পঠিত ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতাত্ত্বিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ আইনের মাধ্যমেই ত্রিচিশ সরকার ভারতীয়দের হতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ আইন ভারতে দীর্ঘ বিদেশি শাসনের সমাপ্তি ঘটায় এবং এক নতুন যুগের সূচনা করে। উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটি এ বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলের দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ লক্ষ করা যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বিদেশি শাসনের অধীনে থাকাই এর কারণ। কর্তৃপক্ষ এ সমস্যার শাস্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিলেও তাতে কাজ হয়নি। অবশেষে তারা দু'সম্প্রদায়কে আলাদা করার চিন্তা করে এবং পার্লামেন্টে এ নিয়ে একটি আইন পাস করে। এ আইন অনুযায়ী দু'সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও এমনটি দেখা যায়। এখানে দীর্ঘদিন ধরে ত্রিচিশ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭) বিদ্যমান ছিল। আবার ত্রিচিশ শাসনাধীনে এখানকার প্রধান দুটি সম্প্রদায় তথা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বার বার স্বল্পের ঘটনা ঘটেছে। ত্রিচিশ সরকার বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগের মাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক হন্ত দূর করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত দু'সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রকেই এর সমাধান মনে করা হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ত্রিচিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয়। এ আইনের ফলে ভারতবর্ষে একশ নববর্ষ বছরের ত্রিচিশ শাসনের অবসান ঘটে আর সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের। এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ছিল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে। ১৭৫৭ সালে প্রস্তনের পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে ত্রিচিশ আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল, এ আইনের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। আইনটি পাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে গৰ্ভন্ত জেনারেল ও গৰ্ভন্তের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ আইন ভারতের মানুষকে বড় কোনো সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেয়। তারা নতুন দেশগঢ়ার স্বপ্ন ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করে। উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা,

সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বৈশ্বিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগ নামে পরিচিত এ ঘটনা উপমহাদেশবাসীর সমকালীন প্রজন্মের মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলে। ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী ও অভিবাসন সংকটেরও সৃষ্টি করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনেক দিক থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ১৩ আলম সাহেবের একজন খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য তার দলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল। *জ. বো. ২০১৬। গ্রন্থ নং ১।*

- ক. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃত সালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১
- খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আলম সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তোমার পঠিত উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মুক্তিসহ লেখ। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।

খ সৃজনশীল তন্ত্র এর 'ৰ' প্রয়োজন দেখো।

গ উদ্দীপকের আলম সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে আমার পঠিত লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সম্বলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এই প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম রাজনীতিতে ইতিবাচক সাড়া জাগায় এবং মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এই প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি অর্জন করে। যেটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আলম সাহেব এক মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার দলের বার্ষিক সম্মেলনে তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবের মধ্যেই তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল। এই প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনোরূপ স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে না- এ সত্যটি উপলব্ধি করে মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবি উত্থাপন করে। যার ফলশুতিতে বহু চড়াই-উত্তোলন পার করে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের উত্তৰ হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির পেশকৃত প্রস্তাব এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব এক ও অভিন্ন।

ঘ লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যন্তর হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীম মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের জোর দাবি জানায়। ১৯৫৪ সালের যুক্তিক্ষেত্রে ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যন্তর ইত্যাদি সরকারিই ছিল লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের বহিপ্রকাশ। পরবর্তীতে স্বায়ত্ত্বাসনের দাবিতে বাঙালিরা আরো সুসংহত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উত্তৃত্ব হয়ে তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালুন্ধি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিপীড়ন চালাতে শুরু করলে বাঙালি জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে বোপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যন্তর হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন ১৪ 'ক' নামক অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। বৃহৎ এই অঞ্চলে ক্রমশ দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও সম্প্রদায় দুইটির অনৈক্যের কারণে অঞ্চলটিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ঔপনিবেশিক শক্তি অঞ্চলটির স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের ফলে 'ক' অঞ্চলটিতে সম্প্রদায়গত পরিচয়ে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্তৰ হয়। *জ. বো. ২০১৬। গ্রন্থ নং ১।*

- ক. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়ে কাকে? ১
- খ. বাংলাদেশ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে তোমার পঠিত যে আইনের সাদৃশ্য রয়েছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় উক্ত আইনটি অপরিহার্য ছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবাব আব্দুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়।

খ যে আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত থেকে ভিত্তিশ শাসনের উচ্ছেদ হয়েছিল এবং দেশের সামগ্রিক অধীনেতৃত্ব ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়েছিল তাকে বলে বাংলাদেশ আন্দোলন।

বাংলাদেশ আন্দোলনের উৎস ছিল ১৯০৫ সালের বজাড়া-বিরোধী গণজাগরণ যা, ১৯১১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। এই আন্দোলন ছিল প্রাক-গান্ধী যুগের সফলতম আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তাগণ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীর সাভারকর, বাল গজাধর তিলক ও লালা লাজপত রায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ গণকোশলটিকে গ্রহণ করে মহাজ্ঞা গান্ধী এটিকে স্বরাজ-এর আজ্ঞারূপে বর্ণনা করেন। এটি বাংলায় সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং এটিকে বলে মাত্রম আন্দোলনও বলা হতো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে আমার পঠিত ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের আইনের মিল রয়েছে।

'ক' নামক অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। বৃহৎ এই অঞ্চলে ক্রমশ দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সংগঠিত হতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও সম্প্রদায় দুটির অনৈক্যের কারণে অঞ্চলটিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ঔপনিবেশিক শক্তি অঞ্চলটির স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করে, যা ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ সরকার মহা সমস্যায় পড়ে যায়। এই সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেখলেন সাম্প্রদায়িকতা মারাত্তাক আকার ধারণ করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষ বিভক্ত করার লক্ষ্যে ৩ জুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এটি কার্যকর করতে ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত করেন। এ বিলে ব্রিটিশ ভারতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এটিই ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত। সুতরাং বলা যায় যে, উক্তিপক্ষের সাথে পাঠ্যবইয়ের ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ক. ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনটি অপরিহার্য ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইন দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। এই আইন ভারতবর্ষের ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দূরীভূত হয়। যদিও দীর্ঘ পথপরিক্রমা, আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা হয়; তথাপি এ উপমহাদেশে রক্তপাতাইন ও স্বাধীনতাযুদ্ধ ব্যতিরেকে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ আইন ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের ক্ষমতা, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদিতে বৈশ্বিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এ আইন দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ► ১৫ মি. করিম ব্রিটিশ উপনিবেশিক অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধ্যাত নেতা। তিনি এই অঞ্চলের সকল জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য তার দলের বার্ষিক সভায় একটি সুপারিশমালা পেশ করেন। এ সুপারিশমালায় এই অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল। অনুপভাবে বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে তিনি এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা তিনি এ প্রস্তাবে উল্লেখ করেন। প্রবর্তীতে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তর হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উক্তিপক্ষের সুপারিশমালার সাথে প্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উক্তিপক্ষে দেখা যায় যে, মি. করিম ব্রিটিশ উপনিবেশিক অঞ্চলের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধ্যাত নেতা। তিনি এই অঞ্চলের সকল জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য তার দলের বার্ষিক সভায় একটি সুপারিশমালা পেশ করেন। এ সুপারিশমালায় এই অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল। অনুপভাবে বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে তিনি এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা তিনি এ প্রস্তাবে উল্লেখ করেন। প্রবর্তীতে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তর হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উক্তিপক্ষের সুপারিশমালার সাথে প্রতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ক. সূজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ১৬ রহিমপুর উপজেলার সবচেয়ে বড় একটি ইউনিয়ন হলো আলীনগর। তাই একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে সমগ্র ইউনিয়ন পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক সুবিধার্থে আলীনগরকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে পূর্ব আলীনগরবাসী বুশি হয়। কারণ তাদের দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু পশ্চিম আলীনগরবাসী এই সিদ্ধান্তে হতাশ হয়। কারণ তাদের প্রভাব কমে যাবে। তাই তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তটি বাতিল করে।

দি. বৰ. ২০১৬। গ্রন্থ নং ৩।

- ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় কখন? ১
 খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উক্তিপক্ষের উল্লিখিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রতিহাসিক ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. 'উক্ত ঘটনাটি তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক চেতনার এক নতুন দিক উন্মোচন করে।' -উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

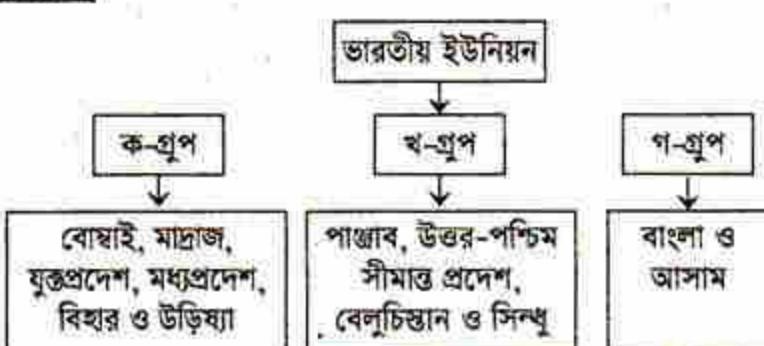
ক. ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়।

খ. সূজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ. সূজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ১৭



দি. বৰ. ২০১৬। গ্রন্থ নং ৩।

- ক. কোন ভারতীয় কাউন্সিল আইনকে মর্লে-মিট্টো সংস্কার আইন বলা হয়? ১
 খ. মজলুম জননেতা বলা হয় কাকে এবং কেন? ২
 গ. উপরে প্রদর্শিত ছকে ব্রিটিশ সরকারের কোন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে? তার প্রেছাপট বর্ণনা করো। ৩

ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন।

- ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন? ১
 খ. কী উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল? ২
 গ. মি. করিমের সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উক্তিপক্ষের সুপারিশমালার আলোকে তোমার পঠিত সুপারিশমালার গুরুত্ব ও তৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মি. করিমের সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত বিষয়টি হলো লাহোর প্রস্তাব।

গ. মি. করিমের সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত বিষয়টি হলো কাউন্সিল আইনকে মর্লে-মিট্টো সংস্কার আইন।

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনকে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন বলা হয়।

খ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়। ত্রিপুরা আমল থেকেই একজন কৃষকের সন্তান হিসেবে ভাসানী দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তিনি বরাবরই ছিলেন জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পরও তিনি কৃষকদের স্বার্থ আদায়, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বাসনের কথা চিন্তা করেন এবং আন্দোলন সংগ্রাম করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর আন্দোলন ছিল জনগণকেন্দ্রিক। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থের জন্য আজীবন কাজ করার কারণে ভাসানীকে তাই মজলুম জননেতা বলা হয়।

গ উদীপকে প্রদর্শিত ছকে ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে।

ছকে উল্লিখিত ভারতীয় ইউনিয়ন তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। ঠিক একইভাবে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নও তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত।

ত্রিটেনে ছিতীয় বিষয়বৃক্ষের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ছিতীয় বিষয়বৃক্ষের পর অন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তন হলে ত্রিপুরা সরকারও তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে ত্রিপুরা পার্লামেন্টে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দাবি ঘটে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে ত্রিটেনের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতে আসেন। এরা ছিলেন—স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেথিক লরেল এবং এডি আলেকজান্ডার। তারা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম অনেকব্য দূর করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মাঝে আপসমূলক আলোচনা না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ধ উক্ত পরিকল্পনা অর্থাৎ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মতপার্থক্য। ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলি হলো—

প্রথমত, মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউই একমত হতে পারেনি। ফলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৬ সালের ২৯ জুন ত্রিপুরা সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থাপিত রেখে তত্ত্ববধায়ক সরকার গঠন করে। এই সরকারে কংগ্রেস যোগদান করলেও মুসলিম লীগ যোগদানে অব্যীকার করে। ফলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট কংগ্রেস জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। সেদিনটিকে মুসলিম লীগ কালো দিবস হিসেবে পালন করে। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয়, যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বৃপ্ত লাভ করে।

চতুর্থত, মুসলিম লীগ এক সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশি দিন টিকতে পারেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বন্দ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

প্রমাণে ১৮ বিশেষ বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচ উপনিবেশ। এই উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনগণ সকল জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কিন্তু দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে একপেশে নীতি বিশেষ করে ত্রিস্টানদের বঞ্চিত করার নীতি গ্রহণ করে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-তিমুরের ত্রিস্টানরা পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কেননা তারা মনে করে প্রথম রাজনৈতিক দলটি ছাড়া তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ সম্ভব হবে না।

তেজ বো. ২০১৬/গ্রন্থ নং ১/

- ক. বজ্রাভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের সংগঠিত করেন কে? ১
- খ. ছি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদীপকে ত্রিস্টানদের রাজনৈতিক দল গঠনের সাথে ত্রিপুরা ভারতের কোন রাজনৈতিক দল গঠনের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
- ঘ. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উক্ত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৰজাভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের সংগঠিত করেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদীপকে বর্ণিত ত্রিস্টানদের রাজনৈতিক দল গঠনের সাথে ত্রিপুরা ভারতের মুসলিম লীগ দল গঠনের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদীপকে দেখা যায় যে, ডাচ শাসন থেকে মুক্তি পেতে ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। কিন্তু দলটি পূর্ব তিমুরের সংখ্যালঘু ত্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্বার্থের ব্যাপারে ছিল উদাসীন। ফলশুতিতে পূর্ব তিমুরের ত্রিস্টানরা তাদের স্বার্থ আদায়ে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা ভারতের মুসলিম লীগ গঠনের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠিত হলে তারা ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ত্রিপুরা সরকারের নিকট তুলে ধরে। ফলে আর সময়ের মধ্যেই দলটি সমগ্র ভারতবাসীর সমর্থন লাভে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালে বজ্রাভঙ্গ হলে কংগ্রেসের অধিকাংশ হিন্দু নেতা এ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে এবং বজ্রাভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা। হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন আক্রমণাত্মক আচরণে মুসলমানরা বুঝতে পারে কংগ্রেস মুসলিম স্বার্থের অনুকূল কোনো দল নয়। এমতাবস্থায় অন্যগুলির ও অবহেলিত মুসলমানদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রগতিশীল নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই বলা যায় যে, উদীপকের ত্রিস্টানদের রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্য ও মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট অভিন্ন।

ঘ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উক্ত রাজনৈতিক দল তথা মুসলিম লীগের অবদান অসামান্য।

মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দলটি বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯১৬ সালের লক্ষ্মী চুক্তি, ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে দলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪০ সালে দলটি ভারতবর্ষের সংকট সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল জিনাহর ছি-জাতি তত্ত্ব। এ ছি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানরা তাদের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশন, ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে প্রগতিশীল সরকারের জিনাহের ছি-জাতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণ করে।

প্রমাণে ১৮ বিশেষ বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচ উপনিবেশ। এই উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনগণ সকল জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কিন্তু দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে একপেশে নীতি বিশেষ করে ত্রিস্টানদের বঞ্চিত করার নীতি গ্রহণ করে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-তিমুরের ত্রিস্টানরা পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কেননা তারা মনে করে প্রথম রাজনৈতিক দলটি ছাড়া তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ সম্ভব হবে না।

প্রম ► ১৯ 'ক' অঞ্চলটি ছিল আয়তন ও জনসংখ্যায় ব্রিটিশ-ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। একজন শাসকের পক্ষে এতবড় প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা ছিল কষ্টকর। তাই প্রদেশটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমউন্নয়ন। ব্রিটিশ সরকার এ অঞ্চলের মানুষকে শাসন করার উদ্দেশ্যে প্রদেশটিকে ভাগ করলেও এটি ছিল একটি অংশের প্রাপ্তের দাবি। একটি অংশ উপরূপ হলেও অপর অংশের সার্বিক বিরোধিতা ও অসহযোগিতার কারণে তা পুনরায় একীভূত করা হয়।

চ. বে. ২০১৬। গ্রন্থ নং ২।

- ক. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন গঠিত হয়? ১
খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' অঞ্চলের বিভাজনের সাথে তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে গঠিত হয়।

খ 'ফরায়েজি আন্দোলন' হলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যা হাজি শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে উঠে। 'ফরজ' শব্দটি থেকে ফরায়েজি শব্দটি এসেছে। 'ফরজ' শব্দের অর্থ অবশ্য পালনীয়।

হাজি শরীয়তউল্লাহর সময় মুসলমান সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার ও বিধৰ্মী আচার-অনুষ্ঠান বিরাজমান ছিল। মুসলমানদের আচার-আচরণে হিন্দু প্রভাব ছিল। তারা শীতলা পূজা, বসন্ত পূজা, কালী পূজা, মহররমে মাতম, ভেলা ভাসানো ইত্যাদি নানা অনৈসলামিক কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় হাজি শরীয়তউল্লাহ বাংলার অধিপতিত মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড নিরসনের জন্য চেষ্টা করেন। তার এ প্রচেষ্টাই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক বজ্ঞানের ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি যুগেপযোগী পদক্ষেপ।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বজ্ঞানের অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। বজ্ঞানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। দল হিসেবে মুসলিম লীগের জন্ম, স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার প্রাপ্তি, বজ্ঞানের রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বজ্ঞানেরই ফলাফল। বজ্ঞানের ফলে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা হলেও এর জন্য উপরূপ ভৌত অবকাঠামো পর্যাপ্ত ছিল না। এজন্য গভর্নর হাউস সচিবালয়, কর্মকর্তাদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। বজ্ঞানের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন— মুরারিচান্দ কলেজকে সরকারিকরণ, জগন্নাথ কলেজকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ, বেসরকারি কলেজে অনুদান প্রদান, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। কিন্তু বজ্ঞানের প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের ব্যাপক উন্নতি হলেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধ অত্যাত তীব্র আকার ধারণ করে। স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক পরিচয় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাকে একত্রিত করার চেষ্টা করে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলে। অন্যদিকে, বজ্ঞানের মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের চিরায়ত প্রথা 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির স্থার্থক প্রয়োগ করে, যা তাদের শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করে।

প্রম ► ২০ জনাব 'S' তার সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা এবং একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। এর আলোকে 'ক' ও 'খ' নামে দু'টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। 'খ' রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর নানা রকম শোষণ, নিপীড়ন চালায়। পরবর্তীতে অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে 'খ' রাষ্ট্রটি ভেঙে 'গ' রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। মূলত 'গ' রাষ্ট্রটির বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই নিহিত ছিল।

চ. বে. ২০১৬। গ্রন্থ নং ৩।

১. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন?
২. মোহাম্মদ আলী জিনাহর প্রদত্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।
৩. জনাব 'S' কর্তৃক উপায়িত প্রস্তাবটির সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
৪. 'গ' রাষ্ট্রটির বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই ছিল— বিশ্লেষণ করো।

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য, যিনি প্রথম গণপরিষদ সদস্য হিসেবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

খ মোহাম্মদ আলী জিনাহর প্রদত্ত তত্ত্বটি হলো 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'। ১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিনাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব, তারা কখনো এক হতে পারে না। সুতরাং, দুটি জাতিকে আলাদা করে মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

গ জনাব 'S' কর্তৃক উপায়িত প্রস্তাবটি আমার পঠিত 'লাহোর প্রস্তাবের' সাথে মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব 'S' তার সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা এবং একাধিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এর আলোকে 'ক' ও 'খ' নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। 'খ' রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠীর নানা রকম শোষণের ফলে 'খ' রাষ্ট্র ভেঙে 'গ' রাষ্ট্রটির জন্ম হয়, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সামঝস্যপূর্ণ।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপায়ন করেন। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের দাবি জানানো হয়, যা মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে। এই প্রস্তাবের পথ ধরেই পাকিস্তান ও ভারত নামক রাষ্ট্রের উত্তৰ হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের উত্তৰ ঘটায়। সুতরাং, বলা যায় যে, জনাব 'S' কর্তৃক উপায়িত প্রস্তাবটির সাথে লাহোর প্রস্তাবই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রম ► ২১ মামুনের ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড়। জনসংখ্যাও অনেক বেশি। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে পুরো ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের অধিবাসীদের একটি অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে। ফলে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে আর এক পক্ষ বিষয়টির বিরোধিতা করে। তবে এই বিভক্তি বেশিদিন স্থায়িত্ব পায়নি এবং একটি পক্ষ এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে।

চ. বে. ২০১৬। গ্রন্থ নং ১।

- ক. কত সালে সর্বভারতীয় নিখিল কংগ্রেস জন্মলাভ করে? ১
- খ. জিন্নাহর ছিজাতি তত্ত্ব সম্পর্কে তুমি কী জান? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক যে ঘটনার মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বভারতীয় নিখিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক প্রবর্তিত ছি-জাতি তত্ত্ব হলো ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণয়ক ও আদর্শশৰ্ম্মী একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছি-জাতি তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব, তারা কখনো এক হতে পারে না। সুতরাং, দুটি জাতিকে আলাদা করে মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চীকৃতি দিতে হবে। তার এ ঘোষণাটি ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ‘ছি-জাতি তত্ত্ব’ নামে খ্যাত।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা বজ্ঞানের সাথে মিল রয়েছে।

বজ্ঞানে বলতে ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ২ ভাগে বিভক্ত করাকে বোঝায়। ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সিই ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এই বিশাল আয়তনবিশিষ্ট জনবহুল বজ্ঞা প্রদেশে একজন প্রশাসকের পক্ষে রাজধানী কলকাতা থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য লর্ড কার্জন প্রশাসনিক অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে বজ্ঞানে করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা প্রেসিডেন্সিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে পূর্ব বজ্ঞা ও আসাম এবং বাংলা প্রদেশ নামে ২টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। যা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বজ্ঞানে পরিচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মামুনের ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার জনগণও তাদের সুবিধার জন্য উক্ত অঞ্চলকে বিভক্ত করার দাবি তোলে। এরূপ অবস্থায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ইউনিয়নটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, উদ্দীপকের ঘটনাটি বজ্ঞানের সাথে মিল রয়েছে। কারণ ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বজ্ঞানে করেছিল এবং পূর্ব বাংলার জনগণ নিজের সুবিধার কথা বিবেচনা করে উক্ত রিষয়টি মেনে নিয়েছিল।

ঘ বজ্ঞানের ফলাফল ছিল মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক এবং হিন্দুদের জন্য নেতৃত্বক।

১৯০৫ সালের বজ্ঞানে মুসলমান জনগণের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্দীপনা জাগ্রত করে। মধ্যবিত্ত মুসলমানরা বজ্ঞানের তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আশীর্বাদ বলে গণ্য করে। মুসলমানরা তাদের পূর্ববর্যাদা ফিরে পায় এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করে। মুসলমানরা অধিকারসচেতন হয়ে ওঠে, হিন্দু আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোজার হয়। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

বজ্ঞানের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল নেতৃত্বক। যদিও নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় নিয়ন্ত্রণের হিন্দুরা মুসলমানদের অনুকূলে বজ্ঞানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্গের হিন্দু এবং গোড়া হিন্দু সম্প্রদায় বজ্ঞানের পক্ষে নিতে পারেনি, বরং চরমভাবে এর বিরোধিতা শুরু করে। হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল

গোষ্ঠী এটিকে বজ্ঞানাত্মক অঙ্গাঙ্গে হিসেবে উল্লেখ করে। কলকাতার আইন ব্যবসায়ীরা তাদের মক্কেল কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা করতে থাকেন। সংবাদপত্রের মালিকরা তাদের পত্রিকার প্রচার ও বিক্রয় ভাসে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। আলোচনা শেষে বলা যায়, বজ্ঞানের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা লাভবান হলেও পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরের প্রতি নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে থাকে।

প্রমাণ ► ২২ সুমনের দাদু গল্প বলায় পটু। প্রতিদিনই সুমন তার দাদুর কাছ থেকে বিভিন্ন গল্প শোনে। দাদু বললেন ‘আজ আমি তোমাকে এমন একজন মহান নেতার গল্প বলব যাব একান্ত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হয়।’

সিঁ বো ২০১৬/গ্রন্থ নং ৩/

- ক. কখন মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণীত হয়? ১
- খ. বজ্ঞানের প্রশাসনিক কারণটি বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিক্ষা বিষ্টারে তার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণীত হয়।

খ ১৯০৫ সালে বজ্ঞানে করা হয়। বজ্ঞান হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো ‘প্রশাসনিক’ কারণ। বিহার ও উত্তরবিষ্যা নিয়ে গঠিত বাংলার আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এত বড় প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। ১৮৬৬ সালে উত্তরবিষ্যা দুর্ভিক্ষ হলে, প্রদেশের বিশালায়তনের কারণে ত্রাণকার্য পরিচালনা ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রদেশে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজন অপেক্ষা কম সংখ্যক কর্মচারী ছিল। যার ফলে প্রদেশ বিভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বজ্ঞানে ঘোষণা করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটি আমার পঠিত পাঠ্যবইয়ের মুসলিম লীগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়।

জন্মলগ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যেসব উদ্দেশ্যে স্থির করা হয় সেগুলো হলো—

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ধের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।
২. মুসলমানের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে অন্ধ্যার সাথে পেশ করা।
৩. উপরে বর্ণিত দুটি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সজ্ঞাব বজায় রাখা। তবে পরবর্তীতে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়—
 ১. মুসলমানদের সরকারি চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
 ২. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সীকৃতি।
 ৩. মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
 ৪. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের উপরোক্তি একটা স্বায়ত্তশাসন প্রস্তুতি অর্জন করা।
 ৫. ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন সুন্দর করা ইত্যাদি।

৪. উদ্বীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আমার পাঠ্যবইয়ের নবাব সলিমুল্লাহ বাক্তিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ছিলেন দুরদশী রাজনীতিবিদ। মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অন্তর্কার্য। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না হলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—

১. আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা: তিনি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

২. মিটকোর্জ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান: মিটকোর্জ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে এটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার উল্লেখ্যবোধ্য অবদান ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রূপ হলে তাঁকে এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হয় যার নামকরণ করা হয় “সলিমুল্লাহ মুসলিম হল”।

৫. সলিমুল্লাহ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা: এদেশের দুর্ঘৰ্য মানুষদের জন্য তিনি একটি এতিমখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং বলা যায়, তদনিন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার অবদান অতুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ একটি দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১/ কোন কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকাটা বলা হয়? ১

২. সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২

৩. উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

৪. উদ্বীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পলাশীর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়।

খ. সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হলো এনফিল্ড নামক রাইফেলের চর্বিমাখানো কার্তুজ যেটাতে গরু বা শূকরের চর্বি বলে প্রচার করা হয়েছিল।

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার এনফিল্ড রাইফেল নামে এক প্রকার নতুন বন্দুক চালু করে। এই বন্দুকের কার্তুজ ছিল চর্বিযুক্ত এবং সেই চর্বি গরু বা শূকরের চর্বি বলে প্রচার ছিল। গরুর মাংস বা চর্বি হিস্তুদের কাছে এবং শূকরের মাংস বা চর্বি মুসলমানদের জন্য নিরিষ্প্র বিধায় এ কার্তুজ ব্যবহার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মনাশ বলে বিবেচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

গ. উদ্বীপকের উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল হওয়ার কারণে একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাই ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের পেছনেও অনুরূপ কারণ বিদ্যমান।

ত্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এ প্রদেশের আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ। একজন গভর্নরের পক্ষে এতবড় এলাকা পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া সুচতুর ত্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে রাজনৈতিক চেতনাকে ধূলিস্থান করার জন্য 'ভাল কর, শাসন কর' নীতির প্রয়োগ ঘটানোর জন্য বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করেছিল। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের ঘটনার সাথে ত্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

৪. সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ 'X' নামক রাষ্ট্রটি একটি বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের বাস। সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। আবার মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লেগে যেত। বিদেশি শক্তি 'X' রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় আইন তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রদায় দুটিকে কোনোক্ষেই খুশি করতে পারে না। অবশেষে দেশটি বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশি শক্তি একটি আইন পাস করে।

১/ ক. কোন কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকাটা বলা হয়? ১

২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

৩. গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত পাসকৃত আইনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন আইনের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

৪. ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত আইনটি ত্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— বিশেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকাটা বলা হয়।

খ. সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত পাসকৃত আইনের সাথে আমার পাঠিত পাঠ্যপুস্তকের ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের আইনের মিল রয়েছে।

উদ্বীপকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, 'X' নামক রাষ্ট্রটি একটি বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের বাস। সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। আবার মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লেগে যেত। বিদেশি শক্তি 'X' রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় আইন তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রদায় দুটিকে কোনোক্ষেই খুশি করতে পারে না। অবশেষে দেশটি বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশি শক্তি একটি আইন পাস করে। ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রেক্ষাপট লক্ষ করা যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্বের ফলে ত্রিটিশ সরকার মহা সমস্যায় পড়ে। এই সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন সর্জ মাউন্টব্যাটেন। নায়িত্ব প্রাপ্ত করার পর তিনি সাম্প্রদায়িকভাবে মারাত্মক রূপ দেখলেন। এরপ পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য লঙ

মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষ বিভক্তি করার লক্ষ্যে ৩ জুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এটি কার্যকর করতে ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত করেন। এ বিলে ব্রিটিশ ভারতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এটিই ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত। অতএব বলা যায় যে, উদ্বীগকের সাথে ভারতবর্ষে প্রণীত ১৯৪৭ সালের আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ব উদ্বীপকে উল্লিখিত ১৯৪৭ সালের আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনটি অপরিহার্য ছিল। এই আইন ছারা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। এই আইন ভারতবর্ষের ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দূরীভূত হয়। যদিও দীর্ঘ পথপরিক্রমা, আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা হয়; তথাপি এ উপমহাদেশে রাষ্ট্রপাতায়ীন ও স্বাধীনতাযুক্ত ব্যতিরেকে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ আইন ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদিতে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ বঙ্গভঙ্গ রূপ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানেরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির অবনতি ঘটে। ফলে তারা তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম নেতৃত্বে এই লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল।

ব. বো. ২০১৬। এন.নং.।

- ক. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১
- খ. ৩ জুন পরিকল্পনা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্বীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উক্ত প্রস্তাবে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ব ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যৰ্থতায় পর্যবসিত হলে ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি সৃষ্টির জন্য তিনি নিরবসন প্রচেষ্টা চালান। ১৯৪৭ সালের ২ জুন নেহেরু, জিনাহ ও শিখ নেতা বলদেব সিংহের সাথে ঘৰোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা তিনি ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতবর্ষের জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এটিই ৩ জুন পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

গ উদ্বীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায়, বঙ্গভঙ্গ রূপ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তারা পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. ভারতবর্ষের উক্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।
৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঞ্চলজাগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত্বাসিত হবে।
৪. ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।
৫. প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ সূজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

- প্রশ্ন** ▶ ২৬ রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে ঢাকায় এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়। ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিপুল বইয়ের সমাহার দেখে তারা অবাক হয়। শাহবাগে ধাবার পর তাদের শিক্ষক জনাব সেলিম সাহেব বুবিয়ে বললেন যে, এ স্থানেই ১৯০৬ সালে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল এবং সে সংগঠনটির নেতৃত্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। /বাজারের টেক্সা মজলস কলেজ, ঢাকা।/ এন.নং.।
- ক. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের সময় বজ্ঞানভঙ্গ করা হয়? ১
 - খ. বি-জাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২
 - গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত কার্জন হল এবং ফুলার রোডের সাথে যে দুজন ব্যক্তির নাম জড়িত বজ্ঞানভঙ্গের সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩
 - ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত স্থানটিতে যে রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উক্ত দলের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের সময় বজ্ঞানভঙ্গ করা হয়।

ঘ সূজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত কার্জন হলের সাথে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন এবং ফুলার রোডের সাথে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নাম জড়িত।

প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে ভারতের তদনীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের বিশাল ভূ-খণ্ডের 'বাংলা প্রেসিডেন্সি'কে বিভক্ত করেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকা হয় এ প্রদেশের রাজধানী; অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরব্যাকে একত্রিত করে বাংলা প্রদেশ গঠন করা হয়। লর্ড কার্জন ঢাকায় এসে ঢাকাকে নতুন শাসন বিভাগীয় এককের কেন্দ্রবিন্দু ঘোষণা করেন। স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলারকে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

উদ্বীপকে দেখা যায়, রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে ঢাকায় আসে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়। আবার তারা ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে যায়। উল্লিখিত কার্জন হল নিম্নিতি হয় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের নামে নির্মিত একটি ভবন। বঙ্গভঙ্গ করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তার নামে ভবনটির নামকরণ করা হয়। অপর দিকে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তার স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় ফুলার রোড। তার আমলেই বজ্ঞানভঙ্গ রূপ করা হয়।

ম. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানটিতে অর্থাৎ শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলটির অর্থাৎ মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯০৬ সালের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নবাব ডিখারুল মুলক। শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমগ্র ভারতের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। নবাব সলিমুরাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রতিনিধির আপত্তির প্রেক্ষিতে কনফেডারেসি শব্দটি পরিয়াগ করে লীগ শব্দটি প্রাপ্ত করা হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর নবাব মুহসিন উল-মূলক ও নবাব ডিখারুল মুলক এ সংস্থার মুগ্ধ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক অগ্রগতিতে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে প্রথমবারের মতো মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের সংকট সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল জিম্মাহর ছি-জাতি তত্ত্ব। মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিম্মাহ 'ছি-জাতি তত্ত্ব' তুলে ধরেন। এ ছি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানরা তাদের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দীঘিদিনের দাবি বাস্তবে বৃপ্যায়িত হয় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে।

অতএব বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ► ২৭ বঙ্গভোজের রন্দ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। দুই জাতির মধ্যে হিংসা বিহৃষ্ট ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির অবস্থা ঘটে। ফলে তারা তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির গুরুত্ব অনুভব করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল।

প্রজাতন্ত্রের সভাপতি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১/

- ক. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে? ১
 খ. তৃ রাজুন পরিকল্পনা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩
 ঘ. উক্ত প্রস্তাবে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল—
 ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ. ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি সৃষ্টির জন্য তিনি নিরবলস প্রচেষ্টা চালান। ১৯৪৭ সালের ২ জুন নেহেরু, জিম্মাহ ও শিখ নেতা বলদেব সিংহের সাথে ঘৰোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পরিকল্পনা প্রাপ্ত করেন তা তিনি ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতবর্ষের জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এটিই ৩ জুন পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বঙ্গভোজ রন্দ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তারা পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।
২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।
৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অজারাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।
৪. ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।
৫. প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা, প্ররক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অন্য পক্ষ তীব্র বিরোধিতা করে।

ব. সূজনশীল ২৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ২৮ রবিদের ইউনিয়নটি বড়। জনসংখ্যাও অনেক বেশি। একজন চোরাম্যানের পক্ষে পুরো ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাহাত্তা ইউনিয়নের অধিবাসীদের একটি অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে তাদের মতামত দেয়। ফলে কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অন্য পক্ষ তীব্র বিরোধিতা করে।

নির্টোর তেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১/

- ক. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কত সালে প্রবর্তিত হয়? ১
 খ. 'বেঙ্গল প্র্যাক্ট' সম্পর্কে কি জান? ২
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে বাংলার ঐতিহাসিক যে বিষয়ের মিল রয়েছে তার পদক্ষেপগুলির বর্ণনা দাও। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়।

খ. সূজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ. সূজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভোজের ফলে পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়ন তুরাবিত হয়।

প্রশ্ন ► ২৯



নির্টোর তেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/

- ক. ১৯৩৭ সালের প্রদেশের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা কত ছিল? ১
 খ. ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ২
 গ. উপরে প্রদর্শিত ছকে ব্রিটিশ সরকারের কোন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে? তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. উক্ত পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৩৭ সালের প্রদেশের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ২৫০ জন।

৪ ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের মাধ্যমে ভারতে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এ আইনে ৫ জন সদস্যকে নিয়ে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। এদের মধ্যে অন্তত ৩ জনকে ১০ বছর ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এ শাসন পরিষদে সাধারণ সদস্য ছাড়াও কমপক্ষে ৬ জন বা অনধিক ১২ জন অতিরিক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়। এসব সদস্য গভর্নর জেনারেল কর্তৃক ২ বছরের জন্য মনোনীত হয়।

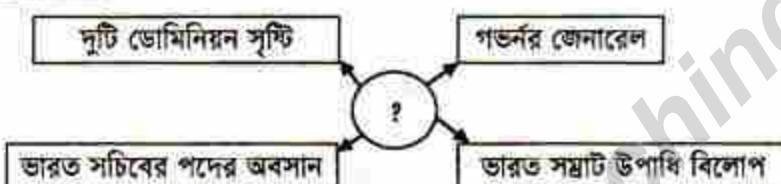
৫ উদ্দীপকে প্রদর্শিত ছকে ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে।

ছকে উল্লিখিত ভারতীয় ইউনিয়ন তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। একইভাবে মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নও তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত।

ত্রিটেনে ছিটীয় বিষয়মুক্তির সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ছিটীয় বিষয়মুক্তির পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তন হলে ত্রিটিশ সরকারও তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে ত্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দাবি ওঠে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে ত্রিটেনের মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্য ভারতে আসেন। এরা হলেন— স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেথিক লরেস এবং এ.ডি. আলেকজান্ডার। তারা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য দূর করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মাঝে আপসমূলক আলোচনা না হওয়ায় মন্ত্রিমণ্ডল তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৬ সূজনশীল ১৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০



নিচের জের কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/

ক. কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? ১
 খ. বারাসাত বিদ্রোহ বলতে কি বুঝা? ২
 গ. উদ্দীপকে ত্রিটিশ ভারতের কোন আইনের চির প্রতিফলিত হয়েছে? ৩
 ঘ. বৃটিশ ভারতের তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উক্ত আইনের তাত্পর্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নোত্তর

ক ছি-জাতি তত্ত্বের আলোকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

খ তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন ছিল অত্যাচারী নীলকর বণিক এবং স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে। তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট বহুবার এ বিষয়ে নালিশ দেন। কিন্তু কোনো সুরাহা না পেয়ে ১৮২৫ সালে ৮৩ হাজার কৃষক সেনাকে নিয়ে ত্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন তিতুমীর এখন এ দেশের নবাব। দেশের সকল প্রজাই স্বাধীন। কৃষকরাই এ দেশের জমির মালিক। আমরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন মানি না। তিতুমীরের এ বিদ্রোহ ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

গ সূজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সূজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সুজনের দাদা গল্প বলায় পুটু। তিনি প্রতিদিন সুজনকে বিভিন্ন গল্প বলেন। দাদা বললেন, আজ আমি তোমায় এমন এক মহান নেতার গল্প বলব যার একান্ত প্রচেষ্টায় বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী হয়।

/কাহীভিয়াল স্কুল এত কলেজ, মাতিবিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১/

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কে চালু করেন? ১

খ. বজ্রভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইংরিজ পাওয়া যায় শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নোত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন আইয়ুব খান।

খ ১৯০৫ সালে বজ্রভঙ্গ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'প্রশাসনিক' কারণ।

বিহার ও উত্তর পার্শ্বে নিয়ে গঠিত বাংলার আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এত বড় প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা কষ্টসাধা ছিল। ১৮৬৬ সালে উত্তিষ্যায় দুর্ভিক্ষ হলে, প্রদেশের বিশালায়তনের কারণে ত্রাণকার্য পরিচালনা ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রদেশে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজন অপেক্ষা কম সংখ্যক কর্মচারী ছিল। যার ফলে প্রদেশ বিভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটি আমার পঠিত পাঠ্যবইয়ের মুসলিম লীগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়।

জন্মলগ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যেসব উদ্দেশ্যে স্থির করা হয় সেগুলো হলো—

১. ত্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ত্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।

২. মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ত্রিটিশ সরকারের নিকট শ্রদ্ধার্থ সাথে পেশ করা।

৩. উপরিউক্ত দুটি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্ভাব বজায় রাখা। তবে পরবর্তীতে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়—

i. মুসলমানদের সরকারি চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

ii. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার স্থাপন।

iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

iv. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের উপর্যোগী একটা স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি অর্জন করা।

v. ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন সুস্থ করা ইত্যাদি।

৬ উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইংরিজ পাওয়া যায় তা আমার পাঠ্যবইয়ের নবাব সলিমুল্লাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন দুরদশী রাজনীতিবিদ। মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অনুরীকার্য।

তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না হলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—

- আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা: তিনি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।
- মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান: মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে এটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ১৯১১ সালে বজ্ঞানজ্ঞ রদ হলে তাঁকে এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
- সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হয় যার নামকরণ করা হয় 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'।

- সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা: এদেশের দুর্ঘাত্মক মানুষদের জন্য তিনি একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং বলা যায়, তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার অবদান অতুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৩২ হিতীয় বিশ্ববৃন্দ জয়ের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি ঐক্যবন্ধ জার্মানির আন্দোলনের ভয়ে জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়। ১৯৯০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি আবার ঐক্যবন্ধ একটি জার্মানিতে পরিণত হয়।

আইটেলস স্কুল এত কলেজ, মার্টিন ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. বেজাল প্যাটের মূল রূপকার কে? ১
- খ. ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয় কেন? ২
- গ. উন্নীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার মিল আছে? দুইটি কারণসহ আলোচনা কর। ৩
- ঘ. "উপমহাদেশের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব ছিল বিপরীতধর্মী।" — বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বেজাল প্যাটের মূল রূপকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।
- খ. শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থ নিয়ে আজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করার কারণেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

ষাটের দশকে আইয়ুব শাসনবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক জ্বালামূর্তী কঠ। তিনি সর্বদাই সাম্যের কথা বলেছেন। কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যাসানে তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কথা সর্বজনবিদিত।

গ. উন্নীপকের ঘটনাটি ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক বজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কার্জনের শাসনামলে বজ্ঞানে করা হয়। মূলত প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করা হলেও এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

১৯০৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশই ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশের শাসনকাজ পরিচালনা করা ছিল কষ্টকর। তাই প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বজ্ঞানে করা হয়। এছাড়া বাংলা প্রদেশের পুরো অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো। এতে পূর্ববঙ্গের জনগণ বিপ্রিত হয়ে চৰম হতাশ হয়ে পড়ে। তাই মুসলমানদের বজ্ঞানের দাবি

পূরণ এবং কলকাতাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাং করার জন্য লর্ড কার্জন বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দেন। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে মুসলমান সম্প্রদায় চৰমভাবে শোষিত ও বিপ্রিত হয়। তাই এর মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ারও ইচ্ছা ছিল ব্রিটিশ সরকারের। এসব কারণে ১৯০৫ সালে বজ্ঞানে করা হয়েছিল। যা উন্নীপকের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ. উপমহাদেশের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব ছিল বিপরীতধর্মী— ট্রিনিটি যথার্থ।

বজ্ঞানের ফলে উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হিন্দু সম্প্রদায় বজ্ঞানের ঘটনাকে বাংলালি জাতির বিকাশমান সংহতি ও চেতনার ওপর আঘাত বলে বর্ণনা করে। আর মুসলমানরা মনে করে বজ্ঞানের ফলে তাদের স্বার্থেরক্ষা হবে।

বজ্ঞানের ফলে বাংলার মুসলমানরা তাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় উজ্জীবিত হয়। পূর্ব বাংলা নামে নতুন প্রদেশ হওয়ায় ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তবে বজ্ঞানের ফলে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দুই সম্প্রদায়ের ওপর বজ্ঞানের এই বিপরীতধর্মী প্রভাবের ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবৃক্ষ ব্রোপিত হয়। হিন্দুরা বজ্ঞানে রান্নের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের বজ্ঞানে রান্নের জন্য মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে।

আপাতদৃষ্টিতে, বজ্ঞানে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর ব্যারা ব্রিটিশদের স্বত্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। কারণ এতে তাদের 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির বিজয় হয়। বজ্ঞানের ফলে ব্রিটিশ সরকার কৌশলে কলকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাং করার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া বজ্ঞানের কারণে রাজনীতিতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিস্তার হটে।

পরিশেষে বলা যায়, বজ্ঞানের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং মুসলমানদের উন্নয়নের পথ প্রসারিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মহানগরীর নগরবাসীদের অধিকরণ সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুইভাগে ভাগ করে 'ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন' ও 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন' নামে পৃথক দুটি সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করে।

ঘ. ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ১/

ক. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল? ১

খ. ট্রি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝা? ২

গ. উন্নীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উন্নীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাং করা—বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল।

খ. সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৫নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ A ও B নামক দুটি সম্প্রদায় একই রাষ্ট্রে বসবাস করত। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে A সম্প্রদায় বিদেশী শক্তির সহায়তায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে কিন্তু B সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে তারা ব্যবসা, শিল্প, কৃষি, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর জনপদে পরিণত হয়। এক সময় বিদেশি শক্তি "ভাগ কর শাসন কর" নীতির ভিত্তিতে নিজেদের সুবিধার্থে উপনিবেশটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেয়।

ঘ. ঢাকা ইয়ালিভিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নং ১/

- ক. হৈত শাসন বলতে কী বুঝ? ১
 খ. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্বীপকে উপমহাদেশের কোন রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উক্ত ঘটনার পেছনে যে অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে সেগুলো বর্ণনা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার শাসনভাব সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো হৈত শাসন।

খ. ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকোশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উক্ত ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে উৎপন্ন হয়।

গ. সূজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রয়োজন দেখো।

ঘ. উক্ত ঘটনার অর্থাৎ বজ্গভজের পেছনে অন্তর্নিহিত অনেক কারণ রয়েছে।

বজ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করার পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এ বিশাল ভূখণ্ডের প্রদেশটিকে কেন্দ্র থেকে একজন গভর্নরের পক্ষে শাসন করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাকব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। এ প্রেক্ষিতে ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্যার চার্লস গ্রান্ট সর্বপ্রথম বাংলা প্রদেশকে দুভাগে বিভক্ত করার সুপারিশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা নগরেই ছিল ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী এবং বাংলা প্রদেশের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আর পূর্ববাংলার কৃষ্ণজীবী মুসলিম জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ শোষণ করে হিন্দু জমিদারশ্বেণি রাজধানী কলকাতায় বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। তারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে পিছিয়ে পড়া পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল চৰম হতাশ। এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলা প্রদেশকে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে। যাতে হিন্দু ও মুসলমানরা এক হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বজ্গভজের পেছনে সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণসহ ব্রিটিশ সরকারের অন্তর্নিহিত কৃট-কৌশল ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ নীলাচল ইউনিয়নটি আয়তনে যেমন বড়, জনসংখ্যাও তেমনি অনেক বেশি। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা কষ্ট ও কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া ইউনিয়নের অধিবাসীদের একটি অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে তাদের মতামত দেয়। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে। অধিবাসীদের একটি অংশ এর তীব্র বিরোধিতা করে। এমনকি সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড চালায়। ফলে এই বিভক্তিকৰণ বেশিদিন টিকে থাকেনি। /বি এন কলেজ, চাকা/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম কত সালে? ১
 খ. জিনাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে বাংলার ঐতিহাসিক যে ঘটনার মিল রয়েছে, তার তিনিটি কারণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের আলোকে বাংলার ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে।

খ. 'বিজাতি তত্ত্ব' হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

মোহাম্মদ আলী জিনাহ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি ব্রহ্ম আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে 'বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক বীতি, জীবন পরিচালনা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি ব্রহ্ম অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে তারা পৃথক দুটি জাতি। তার এই মতবাদটি 'বিজাতি তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

গ. সূজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রয়োজন দেখো।

ঘ. সূজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রয়োজন দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ একটি দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এতো বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। /গজীপুর সিটি কলেজ/ প্রশ্ন নং ১/

ক. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কী? ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালে।

খ. 'বিজাতি তত্ত্ব' হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

মোহাম্মদ আলী জিনাহ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি ব্রহ্ম আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে 'বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক বীতি, জীবন পরিচালনা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি ব্রহ্ম অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে তারা পৃথক দুটি জাতি। তার এই মতবাদটি 'বিজাতি তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

গ. সূজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রয়োজন দেখো।

ঘ. সূজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রয়োজন দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ সোহানাদের শ্রেণিশক্তি ক্লাসে ব্রিটিশ শাসনাধীন একটি দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। একটি শাসন আইনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন— যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার কোনৰূপ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রদেশের শাসনকর্তা হবেন নিয়মতাত্ত্বিক। প্রাদেশিক আইন পরিষদ আইন তৈরি করবে। শিক্ষক বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে, নানাবিধ বাধার কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ কার্যকর করা যায়নি। /নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ১/

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদীপকে উল্লিখিত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা কর।

৩

ঘ. উক্ত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন কেন কার্যকর হয়নি? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অঞ্জোভিয়ান হিউম।

খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলো ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস কর্তৃক সম্পাদিত একটি ভূমি সংক্রান্ত চুক্তি।

এই চুক্তির মাধ্যমে জমিদারদেরকে জমির স্থায়ী মালিকানা প্রদান করা হয়। নিয়মিত ও নিদিষ্ট দিনের মধ্যে খাজনা প্রদানের বিধান রেখে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের জমিদারী হারানোর বিধান রাখা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

গ. উদীপকে উল্লিখিত শাসন আইন অর্ধাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে পর্যালোচনা করা হলো-

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং প্রম মিত্র দেশীয় রাজ্যগুলো নিচে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রদেশে স্বৈতশাসন রহিত হয় এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন প্রবর্তন করা হয়। আর, কেন্দ্রে স্বৈতশাসন প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্র সরকারের বিষয়সমূহ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সংরক্ষিত বিষয় গভর্নর জেনারেল ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে পরিচালনা করতেন। তবে তিনি তাকে পরামর্শদানের জন্য তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারতেন। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতেন। এ আইনে ছিক্ষিক আইনসভা গঠন করা হয়। সংবিধান ছিল দীর্ঘায়িত, জটিল ও দুর্পরিবর্তনীয়। এ আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য আইনের মাধ্যমে রাজ প্রতিনিধি নামক এক নতুন পদ গঠন করা হয়। এ আইনে ভোটাধিকারের যোগ্যতা শিখিল হওয়ায় অনেকে নতুন ভোটার হন।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনতাত্ত্বিক ইতিহাসে এক দীর্ঘায়িত সংবিধান।

ঘ. সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্নঃ ৩৮ ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আতিক একে সিপাহি বিদ্রোহ বলতে নারাজ। সে স্যারকে প্রশ্ন করল, ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা সংগত নয় কেন? শ্রেণিকক্ষে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আতিকের মতকে সমর্থন করল। শিক্ষক বিষয়টি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কৌশল বলে অভিমত দিলেন।

/পুরিশ লাইল স্কুল ড্যাক কলেজ, বৃগত/ এস নং ১/

ক. সিপাহি বিদ্রোহ কী?

১

খ. সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণ কী কী?

২

গ. আতিকের মতে সিপাহি বিদ্রোহকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. শিক্ষকের উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সিপাহি বিদ্রোহ হলো ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম সংগ্রাম, যা ভারতীয় সিপাহিদের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

খ. ১৮৫৭ সালে সংগঠিত সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. এনফিল্ড রাইফেলে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের ব্যবহার যা হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।
২. সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে জাতি-বিহেষ সৃষ্টি, কোম্পানির অদৃশ, পক্ষপাতদুষ্ট ও দুনীতিপরায়ণ শাসনব্যবস্থা।
৩. বৃত্তবিলোপ নীতির অভূতে অন্যায়ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলো অধিকার করা।

গ. হ্যা, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ সিপাহি বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিভাড়িত করে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুন্ধার করা।

সিপাহি বিদ্রোহের বিস্তৃতি ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী। আর তাতে সিপাহিদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে এ বিদ্রোহটি জাতীয়তাবাদী রূপ লাভ করেছিল। সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ব্যারাকপুরে। কিন্তু অতি দুর্ভার সাথে এটি আগ্রা, দিল্লি, মিরাট, পাটনা, কলকাতা এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আরও বিপ্লব, সংগ্রাম, আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল যেমন— তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরিস-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। কিন্তু এর কোনোটিই সর্বভারতীয় ছিল না, কোনটি ছিল অঞ্চলভিত্তিক বা কোনটি ছিল গোষ্ঠী বা দলভিত্তিক। এমনকি উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও এই আন্দোলনগুলোকে স্বাধীনতাকামী আন্দোলন বলা যাবে না। অপরদিকে সিপাহি বিদ্রোহ ছিল সর্বভারতীয় এবং এ বিদ্রোহের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুন্ধার। ইতিহাসবিদরাও সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেমন— বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জেমস আউটরিচ সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক জে. বি. নটন ও ড. মজুমদার এ আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, 'এটা বিদ্রোহ আকারে শুরু হলেও পরে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়।'

ঘ. ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সিপাহিরা যাতে সংঘটিত হতে না পারে এজন্যই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের তৎক্ষণিক কারণ হিসেবে বলা হয় গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের ব্যবহার। সৈন্যদেরকে এ কার্তুজ দাঁত দিয়ে ভেঙে তারপর রাইফেলে লোড করতে হতো। গরু ও শুকরের চর্বি মুখে নেওয়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। তাই ভারতীয় সৈন্যরা এ বংশ্যত্বের বিরুদ্ধে একসাথে বিদ্রোহ করেছিল।

শুধু প্রত্যক্ষ কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল অদৃশ, পক্ষপাতদুষ্ট ও ঘারাঘাক দুনীতিপরায়ণ। তারা দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর কর্তৃত স্থাপন করে বংশানুক্রমিক শাসকদের আভিজ্ঞাত্ব করেছিল, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে জাতি-বিহেষ সৃষ্টি করেছিল, দেশীয় শিরোর ধর্ম সাধন করেছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে ব্যবসায়ী জমিদারদের কৃষি জমির মালিক বানিয়েছিল। তাছাড়া লর্ড ডালহোসি প্রণীত বৃত্তবিলোপ নীতি প্রণয়নের দ্বারা কোম্পানি সাতারা, সহলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, তাঙ্গোর ও কর্ণাটকের অধিকার প্রদণ করে এবং সেখানকার উত্তরাধিকারী শাসকদের বংশিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভুল রাজনৈতিক কৌশলসমূহের ফলশ্রুতিই হলো ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যথার্থই বলেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ অধ্যাপক আব্দুস সালাম প্রেরিকক্ষে ত্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বজ্রাভজ এবং তা রদের ঘটনা অবিভক্ত ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এছাড়াও তিনি কীভাবে ত্রিটিশ সরকার থেকে থারে বিভিন্ন ভারত শাসন আইন দ্বারা এদেশের জনগণকে কিছু কিছু সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করেছিল সে সম্পর্কেও ছাত্রদেরকে ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪০ সালের সাহের প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। *পুনিপ লাইল স্কুল অ্যাড কলেজ, ব্যুক্তি। প্রশ্ন নং ২/*

ক. কথম, কোথায় মুসলিম লীগের জন্ম হয়? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'বজ্রাভজ এবং তা রদের ঘটনা অবিভক্ত ত্রিটিশ ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা'—অধ্যাপক আব্দুস সালামের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সাহের প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল'—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

খ সৃজনশীল তন্ত্র এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ 'বজ্রাভজ এবং তা রদের ঘটনা অবিভক্ত ত্রিটিশ ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা'— উদ্দীপকের আব্দুস সালামের উক্তিটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাদেশকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার সুপারিশপূর্বক একটি প্রতিবেদন ভারত সচিবের নিকট পেশ করেন। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে ত্রিটিশ সরকার ১৯০৩ সালে বজ্রাভজের ঘোষণা জারি করে এবং ১৯০৫ সালে বজ্রাভজ হয়। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হয় ঢাকা এবং স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

বজ্রাভজের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা সান্দেশ হলে হিন্দু ও কায়েমি স্বার্থবাদী মহল বজ্রাভজের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। ত্রিটিশ পণ্য বর্জন করে ব্রিটেনের মিল মালিকদের হাতে ত্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করা হয়। একদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের তীব্র আন্দোলন ও অন্যদিকে স্বার্থবাদীদের হত্যায়ে ত্রিটিশ সরকারকে হতচকিত করে তোলে। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বজ্রাভজকে তিকিয়ে রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালান। ত্রিটিশ রাজমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের শত প্রতিশ্রুতি সম্মেলন বজ্রাভজ স্থায়ী হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ত্রিটিশরাজ কায়েমি স্বার্থবাদী হিন্দুদের বিক্ষেপের নিকট নতি স্থাপন করে এবং ভাইসরয় লর্ড হার্ডিং বজ্রাভজ রদের সুপারিশ করেন। ফলে ১৯১১ সালে বজ্রাভজ রদ করা হয়।

ঘ সৃজনশীল ২ন্ত এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০

প্রতিক্রিয়া	→	১৯১১ সালে সংগঠিত হয়
প্রতিক্রিয়া	→	হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় বলে ধারণা লাভ হয়

আমত্ত পুনিপ ব্যাটেলিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ব্যুক্তি। প্রশ্ন নং ২/

ক. সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয় কত সালে?

খ. কংগ্রেস গঠনে হিউমের অবদান ব্যাখ্যা কর।

গ. উল্লিখিত ছকে কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছকের ঘটনায় হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপরীত— বিশ্লেষণ কর।

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৮৫৭ সালে।

খ ত্রিটিশ ভারতের জনগণের রাজনৈতিক মুক্তির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হলো রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রচেষ্টা।

ত্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করার জন্য জনগণের উপর দমননীতি প্রয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ সময় ভারতের হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করেছিল। এ সময় অ্যালান অষ্টোভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ বেসামরিক কর্মকর্তা ভারতবাসীদের অসত্ত্বাব প্রশামিত করার লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালের ১ মার্চ একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মানবিক উৎকর্ষতা লাভের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন। হিউম ১৮৮৪ সালের প্রথমদিকে ভারতের তদনীন্তন বড়লাট ডাফরিন এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত বাসীর পক্ষে তার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ডাফরিন হিউমের পরিকল্পনাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোঝাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ সৃজনশীল ৫ন্ত এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ ছকের ঘটনায় অর্থাৎ বজ্রাভজ রদের ফলে হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ত্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বজ্রাভজে রদের ঘোষণা করায় পশ্চিম বাংলার হিন্দু বৃন্দিজীবীগণ উল্লিখিত হয়ে ওঠে। কারণ কলকাতাকেন্দ্রিক লোকজন তাদের হারানো প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরে পেয়ে। আবারো কলকাতা সমগ্র বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র পরিণত হওয়ায় ব্যবসায়ীগণ খুশি হয়। পূর্ব বাংলার মক্কেলরা আবার কলকাতায় ছুটে আসবে ভেবে আইনজীবীগণ খুশি হন। এককথায় বজ্রাভজ রদ হওয়ায় কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতা, ব্যবসায়ী ও বৃন্দিজীবীগণ তাদের হারানো পৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরে পেয়ে আনন্দিত হয়। অন্য দিকে বজ্রাভজ রদ হওয়ার ঘোষণা শুনে মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিপ্লবে বিমুচ্ছ ও হতাশ হয়ে পড়ে। বজ্রাভজের ফলে তাদের মধ্যে যে উৎসাহ, প্রাণচ্যুত্য ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল বজ্রাভজ রদের ঘোষণা তা স্মর্থ করে দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ বিকুণ্ঠ হয়ে ওঠে। ত্রিটিশ সরকারের ওপর থেকে মুসলিম জনগণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অনেক মুসলিম নেতাই ত্রিটিশ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ হিন্দুদেরকেও অবিস্মাস করতে শুরু করে।

উদ্দীপকের ছকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমাজের এক অংশের জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে ১৯১১ সালে একটি ঘটনা ঘটে। ভারতীয় কংগ্রেস একে স্বাগত জানায় এবং হিন্দুগণ উত্তুল হয়। সুতরাং ছকের ঘটনাটি ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঘোষিত বজ্রাভজ রদকে ইঙ্গিত করছে যার ফলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ছকের ঘটনায় অর্থাৎ বজ্রাভজ রদের ঘটনায় হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপরীত।

প্রশ্ন ▶ ৪১ মি. এলেক্স ব্রিটিশ উপনিবেশিক অঞ্চলের একটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যাত নেতা। তিনি তাঁর অঞ্চলের সব জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দলের বার্ষিক সভার একটি সুপারিশমালা পেশ করেন। তাঁর সুপারিশমালায় ঐ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের সাথে স্বাধীন অঙ্গরাজ্যসমূহের সম্পর্ক কী হবে বা সংখ্যালঘুদেরও স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

- ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাটালিয়ন পার্কিং স্কুল ও কলেজ, ব্যুক্তি। প্রশ্ন নং ১।
 ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন? ১
 খ. ব্রিটিশদের ভাগ কর ও শাসন কর নীতি ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. মি. এলেক্স এর সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের সুপারিশমালার আলোকে তোমার পঠিত সুপারিশমালার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।

খ. ভাগ কর ও শাসন কর ইংরেজ শাসকদের একটি কৃটকোশল বা কৃটনীতি। এটি ব্রিটিশ সরকারের একটি চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি। ১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতির অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ. সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বঙ্গভঙ্গ রান্ড হওয়ার পর ভারতীয় মুসলিমরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটে। ফলে তাঁরা তাঁদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম নেতৃত্বস্থ এ লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল। / দ্রুগুর শহীদ স্থান প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চীজাইল। প্রশ্ন নং ১।

- ক. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে? ১
 খ. মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ২
 গ. উদ্দীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩
 ঘ. উক্ত প্রস্তাবে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালে।

খ. ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক বিষয়ে ঐক্যবন্ধ ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সবদিক হতে অবহেলিত ও বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও এটি অবহেলিত ও বিচ্ছিন্ন মুসলিমদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিমদের এ অবহেলিত ও ইন্দু অবস্থা হতে উদ্ধারকর্ত্তা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতির সার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ধারক ও বাহক হিসেবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বঙ্গভঙ্গ রান্ড হওয়ার পর ভারতীয় মুসলিমদের বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তাঁরা পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।
২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলিমদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের সময়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।
৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।
৪. ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।
৫. প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ. লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যন্তর হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উদ্ধাপিত লাহোর প্রস্তাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীম মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি জানায়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফুর্টের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক হয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যর্থনা ইত্যাদি সবকিছুই ছিল লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বাহিপ্রকাশ। পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাঙালিরা আরো সুসংহত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বৃত্ত হয়ে তাঁরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিপীড়ন চালাতে শুরু করলে বাঙালি জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝোপঝোপ পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যন্তর হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ ১৮৫৭ সাল —> মহাবিদ্রোহ

১৯০৫ সাল —> ক

১৯৪৭ সাল —> খ

- ক. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেটেরে ভাগ করা হয়? ১
 খ. চিরস্থায়ী বন্দেবন্ত বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকে 'ক' চিহ্নিত স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি কেন বদ করা হয়েছিল? বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের 'খ' চিহ্নিত স্থানের উপর্যুক্ত বিষয়টি ভারতবর্ষের বিভক্তির সাথে জড়িত। বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল।

খ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলো ১৯৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রশাসন কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

এ চুক্তির আওতায় জমিদার উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির নিরক্ষুশ স্বত্ত্বাধিকারী হন কিন্তু জমিদারগণ নিদিষ্ট সময়ে নির্ধারিত করা প্রদানে সক্ষম না হলে এ মালিকানা স্বত্ত্ব বিলুপ্ত করা হবে বলে এ ব্যবস্থায় উল্লেখ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের শাসনকে পাকাপোন্ত করার চেষ্টা চালায়।

গ উদ্দীপকে **ক** চিহ্নিত স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো বজাভঙ্গ।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ঐতিহাসিক বজাভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বজাভঙ্গ করলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বজাভঙ্গ করে। তবে ব্যাপক আন্দোলনের মুখ্যে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বজাভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। এর পেছনে অনেক কারণ ছিল।

মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার কারণে বজাভঙ্গ রদ করা হয়। বজাভঙ্গের ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি উপকৃত হবে ভেবে বর্ণবাদী ও কায়েমি হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা বাংলাদেশ আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্তানী আন্দোলনের ডাক দেয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বজাভঙ্গের বিপক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটিশ রাজা নতি স্বীকার করে বজাভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বজাভঙ্গ রদ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে **খ** চিহ্নিত স্থানটি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনকে নির্দেশ করে। যা ভারতবর্ষের বিভক্তির সাথে জড়িত।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দুটি ডেমোনিয়ন সৃষ্টি, ভারত সচিবের পদের অবসান এবং ভারত সন্ত্রাট উপাধি বিলোপ করা হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইন অনুযায়ী ভারত সচিব পদের বিলুপ্তি ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রাখার দায়িত্ব কমনওয়েলথ সেক্রেটারির ওপর অপর্ণ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে প্রতিটি ডেমোনিয়নের একজন গভর্নর জেনারেল থাকার বিধান করা হয়। ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী রাজকীয় মর্যাদা ও উপাধি হতে ভারত সন্ত্রাট উপাধি বিলুপ্ত হয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে ব্রিটিশ ভারতের ১৯৪৭ সালের আইনকে ইঙ্গিত করেছে।

প্রশ্ন **৪৪** বিশাল আয়তন নিয়ে গঠিত অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন জনাব মানিক মিয়া। তার একার পক্ষে বিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হচ্ছিল। এর ফলে কর্তৃপক্ষ বিশাল অঞ্চলকে 'ক' ও 'খ' অঞ্চলে বিভক্ত করে। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ খুশি হলেও 'খ' অঞ্চলের জনগণ তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে দুই অঞ্চলকে পুনরায় একীভূত করা হয়।

পিটি গজ: ডিজী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-১।

- ক. ব্রিটিশরা কত বছর ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছিল? ১
খ. 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল হিজাবি তত্ত্ব'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ 'ক' অঞ্চলের জনজীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছিল।
খ. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল হিজাবি তত্ত্ব। হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। এই ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মতবাদই হলো হিজাবিতত্ত্ব। আর এই হিজাবি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতবর্ষের উত্তর-পঞ্চম এবং পূর্বভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থনে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে।
গ. সূজনশীল ৯নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
ঘ. সূজনশীল ৯নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

- প্রশ্ন **৪৫** অধ্যাপক ডালিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে পড়ছিলেন। তিনি একটি ভারত শাসন আইনে দেখতে পেলেন যে, উক্ত আইন দ্বারা প্রদেশগুলোতে বৈতান প্রবর্তন করা হয়। তার প্রায় মোল বছর পর আর একটি ভারত শাসন প্রণীত হলে এতে প্রদেশ প্রবর্তিত বৈতান প্রিলুপ করা হয়। তবে এবারে কেবল বৈতান প্রবর্তিত হয়। শেষেকালে ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রদেশগুলোকে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন। সহজে সুল এত কলেজ উৎপন্ন। এর নং-১।
ক. কত সালে, কোথায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়? ১
খ. বজাভঙ্গ হলে পূর্বভারতের মুসলমান জনগণ কেন উৎকুল হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত বৈতান প্রদানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ৩
ঘ. 'শেষেকালে ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান হয়েছিল তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন' উদ্দীপকে বর্ণিত উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'-এর জন্ম হয়।
খ. বজাভঙ্গের ফলে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হয়। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ফলে মুসলমানগণ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়। ঢাকায় অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বড় বড় সুরক্ষা অট্টালিকা গড়ে উঠায় ঢাকার প্রীবিল্ড ঘটে। এছাড়া ঢাকরি-বাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ভেবে তারা উৎকুল হয়ে উঠে।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ভারত শাসন আইন বলতে এখানে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত বৈতানশাসনের অধ্যকার পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো—
প্রথমত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রদেশে বৈতানশাসন প্রবর্তন করা হয়। অন্যদিকে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে বৈতানশাসন প্রবর্তন করা হয়।

তৃতীয়ত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রাহ্মণা, কৃষি, শিল্প ও স্থানীয় শাসন। অপরদিকে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল শিক্ষা, ব্রাহ্মণা ও আইন-শৃঙ্খলা।

তৃতীয়ত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, পুলিশ ও অর্থ। অন্যদিকে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে সংরক্ষিত বিষয়ের মধ্যে ছিল দেশব্রহ্মা, পররাষ্ট্র ও ধর্মীয় বিষয়।

ব শেষোক্ত ভারত শাসন আইনে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন— এ উক্তিটি যথার্থ।

আমরা জানি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ প্রদেশে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রদেশের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত থেকে প্রদেশের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসনের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শুধু তত্ত্বগতই ছিল, বাস্তবে নয়। কারণ এ আইনে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের অপরিসীম ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে উঠেনি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল, গভর্নর এবং ভারত সচিবের অংশিত হস্তক্ষেপের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা ব্যর্থভাবে পর্যবসিত হয়।

অতএব বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল অকার্যকর, নামমাত্র ও অর্থহীন।

প্রশ্ন ৪৬ জনাব ইমতিয়াজ একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তিনি তার এক বৃক্তায় ইংরেজদের আগমন এবং দূরভিসম্বিধির চক্রান্তের এক প্রামাণ্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ দেশের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠা কতিপয় ব্যক্তির চরম বিশ্বাসঘাতকতার দিকও তুলে ধরেন। যার ফলশ্রুতিতে জাতিকে প্রায় দুইশত বছরের মানি সইতে হয়।

জনাব ইমতিয়াজ (স্কুল এজেন্সি), বেজা, পাবনা। প্রশ্ন নং ২/

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবন্ধ কে? ১

খ. 'ভাগকর, শাসন কর' নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উক্তিপক্ষে যে শাসকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের আগমনের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উক্তিপক্ষে উল্লেখিত কতিপয়দের চরম বিশ্বাসঘাতকতা এদেশের স্বাধীনতা সূর্য অন্তর্মিত হওয়ার অন্যতম কারণ-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবন্ধ ত্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কর্নওয়ালিস।

খ ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ত্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ত্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোন্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকোশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ত্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

গ উক্তিপক্ষের শাসকদের অর্থাৎ ত্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের কারণ ছিল বাণিজ্য করা।

ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার লক্ষ্যে ত্রিটিশরা ১৫৯৯ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে লক্ষ্যে 'The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। ১৬০০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে ত্রিটিশ রাজের সনদ লাভ করে সংগঠনটি 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে পরিচিতি লাভ করে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমন করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে উড়িষ্যা উপকূলে পৌছায় এবং বালেষ্ঠ ও হরিহরপুরে কৃষ্ণ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

ইংরেজরা সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি সম্বলিত একটি ফরমান লাভ করে। তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন। এ সুবিধাটি প্রবর্তীতে কোম্পানিকে বাংলার রাজনৈতিক আধিপত্য বিষ্টারে সাহায্য করে। ১৬৯০ সালে মুঘল সম্রাট ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে একটি সম্বিচৃষ্টি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে কোম্পানি সমগ্র ভারতবর্ষে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিয়য়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়।

ঘ উক্তিপক্ষে উল্লেখিত কতিপয়দের চরম বিশ্বাসঘাতকতা এদেশের স্বাধীনতা সূর্য অন্তর্মিত হওয়ার অন্যতম কারণ- উক্তিটি যথার্থ।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই নবাবের কিছু ক্ষমতালোভী আঢ়ীয় ও রাজ দরবারের কয়েকজন সভাসদ ইংরেজ বণিকদের সাথে মিলে নবাবের বিবুল্দে ঘড়িয়ে লিপ্ত হয়। মীর জাফর আলী খান, কৃষ্ণচন্দ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ, উমিচান্দ, কোম্পানির কর্মকর্তা ওয়াটসন নবাবের বিবুল্দে বিভিন্ন ঘড়িয়ে করতে থাকে। তারা পলাশীর প্রান্তরে নবাবকে পরাজিত করার মাধ্যমে তাদের ঘড়িয়ের প্রতিফলন ঘটায়।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি রবার্ট ফ্লাইড বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণে অগ্রসর হলে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ পলাশী প্রান্তরে উপস্থিত হন। উক্ত যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মোহন লাল, মীর মদন ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রের আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কুপরামণ্ডে নবাব সেনিলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করেন। ফ্লাইড মীরজাফরের ইঞ্জিতে বিশ্বামরত নবাব বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং নবাব বাহিনী পরাজিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য ২শত বছরের জন্য অন্তর্মিত হয়।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪৭ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশটি বিশাল বড় এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশী। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সম্প্রতি এ প্রদেশটি বিভক্ত করে তেলেজনা নামক আরও একটি প্রদেশ স্থাপন করে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। কিন্তু এর প্রতিবাদে সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল আন্দুলন শুরু করছিল। তৃতীয় পর্যায়ে তেলেজনা ভারতের ২৯তম প্রদেশে পরিণত হলো।

জনাব একজেমি (স্কুল এজেন্সি), বেজা, পাবনা। প্রশ্ন নং ১/

ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কতসালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১

খ. বৈত শাসন বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উক্তিপক্ষের ঘটনাটি তোমার পাঠ্য বইয়ের যে বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য তার কারণসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার ফলাফল বর্ণনা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।
 খ. সৃজনশীল ৫নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।
 গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে আমার পৃষ্ঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর যে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়, তা ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে ভারতের তদনীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের বিশাল ভূ-ভঙ্গের 'বাংলা প্রেসিডেন্সি'কে বিভক্ত করেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের অন্ত্র প্রদেশটি বিশাল বড় এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশি। তাই প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এ প্রদেশটি বিভক্ত করে তেলেঙ্গানা নামক আরো একটি প্রদেশ করা হয়। উদ্দীপকের এ ঘটনাটি বঙ্গভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ ব্রিটিশ শাসনামলে বঙ্গ প্রদেশটি ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রদেশ এবং এর জনসংখ্যাও ছিল অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি।

- ঘ. সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ হাইতিতে প্রথমে স্পেনীয় ও পরে ফরাসিয়া উপনিবেশ গড়ে তোলে। উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ হতে মুক্তির জন্য মি. জ্যা জ্যাক ডেসলিনি ও মি. রোলান্ড দুটি ধারায় আন্দোলন শুরু করেন। উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কাছে মি. জ্যা জ্যাক ডেসলিনি একটি রিপোর্ট ও মি. রোলান্ড চৌক দফা দাবি পেশ করেন। উক্ত রিপোর্ট ও দাবির প্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী একটি সংক্ষিপ্ত দলিল পেশ করেছিল এবং এই দলিলে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার উন্নোত্তর করা হয়েছিল।

।/ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা।। প্রশ্ন নং ১।

- ক. কাকে 'হিজাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা বলা হয়? ১
 খ. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের স্বারা আইনসভার ক্ষমতা কীবৃপ্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকে ইতিহাসিক কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কতটুকু কার্যকরী হয়েছিল বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মোহাম্মদ আলী জিমাহকে হিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা বলা হয়।
 খ. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের স্বারা আইনসভার ক্ষমতা উন্নোত্তোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছিল।
 এ আইনের মাধ্যমে আইন পরিষদের সদস্যগণকে বাজেট উপস্থাপন করার এবং জনস্বার্থ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। তবে রাজস্ব সংক্রান্ত শুল্ক, সরকারি ঋণ, প্রতিরক্ষা প্রতি বিষয়ের উপর প্রস্তাব গ্রহণ বা আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল।
 গ. সৃজনশীল ১০নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
 ঘ. সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ জনাব 'S' এর উদ্যোগে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে 'ক' ও 'খ' নামক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। 'খ' রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর অনেক অন্যায় অভ্যাচার চালায়। অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর 'খ' রাষ্ট্র ভেঙ্গে 'গ' রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। মূলত 'গ' রাষ্ট্রটির স্বাধীনতার বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই নিহিত ছিল।

।/ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা।। প্রশ্ন নং ২।

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন?

খ. মোহাম্মদ আলী জিমাহ প্রদত্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'S' কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই ছিল ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

- খ. সৃজনশীল ২০নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

- গ. সৃজনশীল ২০নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫০ সালের কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়। ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিপুল বইয়ের সমাহার দেখে অবাক হয়। তার শিক্ষক বললেন, এ স্থানেই ১৯০৬ সালে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য হয়েছিল, যে সংগঠনটির নেতৃত্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য হয়। /ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা।। প্রশ্ন নং ১।

ক. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয়? ১

খ. হিজাতি তত্ত্ব কী? ২

গ. উদ্দীপকে উন্নোত্তীত কার্জন হল এবং ফুলার রোডের সাথে যে দুজন ব্যক্তির নাম জড়িত বঙ্গভঙ্গের সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উন্নোত্তীত শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

- খ. সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

- গ. উদ্দীপকে উন্নোত্তীত কার্জন হল এবং ফুলার রোডের সাথে লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নাম জড়িত।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উত্তরাখণ্ড নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। আর বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জনকে সার্বিকভাবে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন অভিজ্ঞ প্রশাসক স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। এ জন্য বঙ্গভঙ্গের পর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে ভারত সচিবকে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এরপর ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করেন।

উদ্দীপকে সালেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও ফুলার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দেখতে পায়। এই কার্জন হল ও ফুলার রোডের নামকরণ হয়েছে লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নামানুসারে। আর লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার উপরোক্তভাবে বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তাই বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের সাথে লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নোত্তীত শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনটি হলো মুসলিম লীগ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে এ সংগঠনটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক অগ্রগতিতে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগের অধীনেই পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nation Theory) তুলে ধরেন। এর ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে প্রথমবারের মতো মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের সংকট সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানরা তাদের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

অতএব বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৫১ সূত্রাপুর ইউনিয়নটি অনেক বড় এবং বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়লে এক অংশের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বিভক্তির দাবি উঠে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আরো বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সূত্রাপুর ইউনিয়নটি দুইভাগে বিভক্ত করে। এতে অপর এক পক্ষ বিভক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে এ বিভক্তি বেশিদিন স্থায়িত্ব পায়নি।

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫।

- | | |
|---|---|
| ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন কী? | ১ |
| খ. ভাগ কর ও শাসন কর নীতি ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ত্রিপিশ ভারতের ঐতিহাসিক যে ঘটনার মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ঐতিহাসিক বিভক্তি কেন স্থায়িত্ব পায়নি-ব্যাখ্যা কর। | ৪ |

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন বলতে প্রদেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ. ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ত্রিপিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ত্রিপিশের ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার পরিবর্তন করেছিল। তাই তারা সুকোশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ত্রিপিশের তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

গ. সূজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ঐতিহাসিক বিভক্তি স্থায়িত্ব না পাওয়ার কারণ হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম বিরোধিতা এবং অসহযোগিতা।

বজ্ঞাভঙ্গের ফলে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অধীনেতৃক জীবনব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বজ্ঞাভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা উপকৃত হলেও হিন্দু সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা এটাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে দাবি করে। ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং অন্তিবিলম্বে তা এক দুর্বার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তারা বিলাতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী আন্দোলনের ভাক দেয়।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে তারা বিলাতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে ত্রিপিশ মিল মালিকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, যাতে ত্রিপিশ সরকার বজ্ঞাভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বজ্ঞাভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশি আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ত্রিপিশ সরকার হিন্দুদের কাছে নতি ঝীকার করে বজ্ঞাভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বজ্ঞাভঙ্গ রদ করা হয়।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম বিরোধিতা এবং অসহযোগিতার কারণে বজ্ঞাভঙ্গ স্থায়িত্ব পায়নি।

প্রশ্ন ৫২ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরাজমান ছিল। তারা একটি বিদেশী শাসনের অধীন ছিল। এ অবস্থা হতে পরিবাগের জন্য এই অঞ্চলের জনগণ এক্যুবন্ধ হয়। এই অঞ্চলের দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তার প্রেক্ষিতে এই বিদেশী সরকার একটি আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্য হয়। ফলে পৃথিবীর বুকে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

- /অগ্রবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১।
- | | |
|--|---|
| ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে? | ১ |
| খ. হৈতে শাসন ব্যবস্থা বলতে কি বুঝা? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সঙ্গে তোমার পঠিত যে আইনের মিল রয়েছে তার ওটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে যে আইনের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য বর্ণনা কর। | ৪ |

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অ্যালান অঞ্জোভিয়ান হিউম।

খ. সূজনশীল ৫২নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সাথে আমার পঠিত ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারত উপমহাদেশের শাসনতাত্ত্বিক অগ্রগতির ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ আইনের মাধ্যমেই ত্রিপিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ আইন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি দীর্ঘ শাসনকালের সমাপ্তি ঘটায় এবং একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত দক্ষিণ এশিয়ার দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ লক্ষ করা যায়। এর কারণ হলো দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বিদেশী শাসনের অধীনে থাকা। তবে এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলেও তা সমাধান হয়নি। অবশেষে কর্তৃপক্ষ দুসম্প্রদায়কে আলাদা করার চিন্তা করে এবং পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করে। এ আইন অনুযায়ী দুসম্প্রদায়ের জন্য দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপিশ শাসন (১৯৫৭-১৯৪৭) বিদ্যমান ছিল। এ কারণে এখানকার প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের তথা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিন্দু লেগেই থাকত। এ অবস্থায় ত্রিপিশ সরকার বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের সাম্প্রদায়িকতা দূর করার চেষ্টা করে। অবশেষে ভারতের সর্বশেষ বড়গাঁট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ত্রিপিশ পার্লামেন্টে '১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এ আইনের ফলে ভারতবর্ষে একশত নকাই বছরের ত্রিপিশ শাসনের অবসান ঘটে। আর জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন সার্বভৌম দুটি রাষ্ট্র। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

য. উদ্দীপকের আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে। ১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ অধিগত্যের সূচনা হয়েছিল, এ আইনে তার সমাপ্তি ঘটে। এ আইন পাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন ও স্বার্বভৌম দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ আইন ভারতীয়দেরকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেয়। এতে ভারতীয়রা নব-নব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। এ আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পথ চলা শুরু করে। ফলে উপমহাদেশের জনগণের কৃষি, সভ্যতা, সাহিত্য, জীবন্যাত্মার ধরণাবলী ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের পথে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রদা ▶ ৫৩ আবুল হাসান একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলের কাউন্সিল মিটিংয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক দলটি এই প্রস্তাব সংশোধন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিদেশি শাসকগোষ্ঠী কোনো উপায় না দেখে একটি আইনের মাধ্যমে বৃহৎ রাষ্ট্রটিকে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করে।

জনাবাবদ ক্যাস্টেনহেক্ট প্রাবল্যিক স্কুল এচ ক্লেচ, সিলেট। এপ্র নং ৩।

ক. হৈতশাসন কী? ১

খ. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রস্তাবের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে? উক্ত প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত আইনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৩৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবাট ক্লাইড দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে হৈতশাসন বলে।

খ. ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ভারতের প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

এতে বলা হয়, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে প্রদেশগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তারা তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর অনুগত প্রাদেশিক গভর্নর প্রদেশে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক গভর্নর প্রাদেশিক সরকারের কাজের ওপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। এর ফলে প্রাদেশিক শাসন অনেকটা প্রহসনে পরিণত হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রস্তাবের সাথে আমার পঠিত শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক কর্তৃক উৎপাদিত লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে। নিচে লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো—

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সম্বলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ইতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। লাহোর প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করলে মুসলিম লীগের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় প্রতিভাব হয়।

- ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমষ্টিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।
- এভাবে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।
- ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শক্রমে তাদের শাসনতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকরি ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতাত্ত্বিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- অঞ্চল বা প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সব ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ. সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রদা ▶ ৫৪ মি. মিশেল একটি বড় অঞ্চলের প্রশাসক। অঞ্চলটি আয়তনে বড় হওয়ার কারণে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মি. মিশেল সরকারের নিকট অঞ্চলটিকে বিভক্ত করার আবেদন জানালে সরকার রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলটিকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত করে। এতে উত্তরাঞ্চলের জনগণ খুলী হয়। উত্তরাঞ্চলের জনগুলি নেতো আবুল আলিম অনুধাবন করেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ এই বিভক্তিকরণ মানবে না। এজন্য দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের বিভক্তিকরণ বিরোধী তৎপরতাকে মোকাবিলা করার জন্য তিনি একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। জনাবাবদ ক্যাস্টেনহেক্ট প্রাবল্যিক স্কুল এচ ক্লেচ, সিলেট। এপ্র নং ৩।

ক. কোন আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. মোহাম্মদ আলী জিমাহ প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আবুল আলিমের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সঙ্গে তোমার পঠিত কোন সংস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণের কারণ এবং তোমার পঠিত ইতিহাসিক ঘটনাটির বিভক্তিকরণের কারণ কি একই ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ভারত শাসন আইন ১৮৫৮'-এর মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।

খ. মোহাম্মদ আলী জিমাহ প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্বটি হলো ই-জাতিতত্ত্ব। এটি ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক বীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। এ মতবাদটিই ই-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ. উদ্বীপকের আব্দুল আলিমের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সাথে আমার পঠিত মোহামেডান প্রভিসিয়াল ইউনিয়ন সংস্থাটির মিল আছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক শ্রেণির হিন্দু সামন্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত। এ অবস্থায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ নামে আলাদা প্রদেশ গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করেন। এ সুপারিশের উপর্যোগিতা বিবেচনা করে এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করেন। স্যার সলিমুল্লাহ উপলব্ধি করেছিলেন, বজ্ঞাভঙ্গ হলে শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দু সমাজ এর বিরোধিতা করবে। তাই তিনি মোহামেডান প্রভিসিয়াল ইউনিয়ন নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। উদ্বীপকেও এমনটি লক্ষণীয়।

উদ্বীপকে মি. মিশেল একটি বড় অঞ্চলের প্রশাসক। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি এ অঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি অংশে বিভক্ত করেন। উত্তরাংশের জনগণ খুশি হয়। কিন্তু দক্ষিণাংশের জনগণ বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা মোকাবেলার জন্য উত্তরাংশের জনগণ আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। তাই বলা যায়, আব্দুল আলিমের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সাথে মোহামেডান প্রভিসিয়াল ইউনিয়ন সংস্থাটির মিল আছে।

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণের কারণটি হলো প্রশাসনিক কারণ। আমার পঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ বজ্ঞাভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে।

বজ্ঞাভঙ্গের বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম হলো প্রশাসনিক কারণ। অবিভক্ত বাংলার আয়তন ২ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। এত বিশাল আয়তন এবং বিপুল জনসংখ্যা অধুরিত বাংলাকে একজন গভর্নরের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ১৯০৫ সালে বজ্ঞাভঙ্গ করে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। উদ্বীপকেও এমনটি লক্ষণীয়।

স্যার অ্যালান অটোভিয়ান হিউম এর প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। এ কারণে ব্রিটিশ সরকার 'Divide and Rule' নীতি প্রয়োগের চেষ্টা চালায় বজ্ঞাভঙ্গের মাধ্যমে। এছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও বজ্ঞাভঙ্গ করা হয়। বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার পাট উৎপন্ন হলেও পাটকলগুলো গড়ে ওঠে কলকাতায়। ফলে কলকাতা অঞ্চল সময়েই সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে, বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের সমস্যার কথা উল্লেখ করে বড়লাটকে পত্র লিখলে তিনি পত্রের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে ১৯০৫ সালে বজ্ঞাভঙ্গ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও বজ্ঞাভঙ্গের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

প্রয়. ৫৫ আলম সাহেব একজন খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য তার দলের বর্ধিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল। /স্বত্ত্বারসহোম, সিলেট/ প্রফ. নং ১০।

- ক. ইন্সট ইভিয়া কোম্পানি কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১
খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলম সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে উদ্বীপকের প্রস্তাবের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— তুমি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ইন্সট ইভিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।
খ. সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।
গ. সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
ঘ. সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রয়. ৫৬ 'X' নামক রাষ্ট্রটি একটি বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের বাস। সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। আবার মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লেগে যেত। বিদেশি শক্তিটি 'X' রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় আইন তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রদায় দুটিকে কোনোভাবেই খুশি করতে পারে না। অবশেষে দেশটি বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশি শক্তি একটি আইন পাস করে। আইনটিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দুটি জোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

/স্বত্ত্বারসহোম, সিলেট/ প্রফ. নং ৩।

- ক. কোন কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্ট বলা হয়? ১
খ. বজ্ঞাভঙ্গ কেন বন্দ হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত পাশ্চাত্য আইনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন আইনের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে পুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ছয়দশা কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্ট বলা হয়।
খ. হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার কারণে বজ্ঞাভঙ্গ বন্দ করা হয়।
বজ্ঞাভঙ্গের ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি উপকৃত হলে বর্ণবাদী ও কায়েমি হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা স্বদেশ আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্তানী আন্দোলনের ডাক দেয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বজ্ঞাভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশ আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্তানবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটিশরাজ হিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার করে বজ্ঞাভঙ্গ বন্দের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বজ্ঞাভঙ্গ বন্দ করা হয়।
গ. সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
ঘ. সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রয়. ৫৭ 'ক' নামক একটি দেশে ব্রিটিশ বণিক কোম্পানি কৌশলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই কোম্পানি ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে ও ধীরে ধীরে 'ক' নামক দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করতে সচেষ্ট হয়। 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি প্রণয়ন করে তারা প্রায় দুইশ বছর দেশটিকে শাসন ও শোষণ করে প্রশাসনিক সুবিধার দোষাদি দিয়ে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে। ফলশুতিতে বড় দুটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিবরণ ছাড়িয়ে পড়ে।

/সাতকীরা সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রফ. নং ১।

- ক. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২
গ. উদ্বীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের উপর্যুক্তদেশের কোন ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত বিভক্তি করণের ফলে যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তার সাথে তোমার পঠিত বিষয়ের বিভক্তিকরণের প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মোহাম্মদ আলী জিনাহ।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে উথাপিত প্রস্তাবনাই হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাবটি উথাপন করেন। বস্তুতপক্ষে, ভারতের মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত পার্থক্যের ফল ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবকে কখনও কখনও 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

৫. সূজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

৬. সূজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ 'A' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ আয়তনে বেশ বড়। এ প্রদেশে 'ক' ও 'খ' দুটি অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলটিতে সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় 'খ' অঞ্চলের লোকদের বিভিন্ন কাজে 'ক' অঞ্চলে আসতে হয়। এছাড়াও নানা সমস্যা প্রদেশটিতে লেগেই থাকত। 'খ' প্রদেশের দাবির মুখে অবশ্যে শাসকগোষ্ঠী 'ক' ও 'খ' অঞ্চল দুটোকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করে।

/বাসকারি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২/

ক. কত সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়?

খ. লাহোর প্রস্তাবের ২টি বৈশিষ্ট্য সেখ।

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে রাজনৈতিক ঘটনার

সাদৃশ্য রয়েছে তার প্রধান ঢটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এটি কি শেষ পর্যন্ত রাদ করা হয়েছিল? কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালে।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক যে দাবি উথাপন করেন তাই ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। এ দাবির দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ভৌগোলিকভাবে পৃথক অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনাত্মিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাজনৈতিক ঘটনা বজাভজের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

বজাভজের পেছনা বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। সেগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কারণ ছিল অন্যতম।

প্রথমত, ত্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি ছিল 'Divide and Rule Policy' (ভাগ কর ও শাসন কর নীতি)। ক্রমবর্ধমান ত্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ত্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা ভারতের প্রধান দুটি ধর্মকে হতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এ নীতির বাস্তবায়নের জন্য তারা হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে বজাভজের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতীয়রা ঐক্যবন্ধ হওয়ার চেষ্টায় ১৮৮৫ সালে গড়ে তোলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বাংলা প্রদেশ বিশেষ করে কলকাতা ছিল কংগ্রেসের অন্যতম সূতিকাগার। ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাং এবং বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বজাভজ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

তৃতীয়ত, আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে পণ্ডিতগুলোর সংঘার হয়। ফলে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে বজাভজের প্রতি সমর্থন জানায়।

৬. বজাভজ শেষ পর্যন্ত রাদ করা হয়েছিল।

বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববজের প্রশাসনিক কেন্দ্র পরিণত হয়। ঢাকাকে নতুন শাসন বিভাগীয় এককের কেন্দ্রবিন্দু ঘোষণা করা হলে পূর্ববজের জনগণ বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি উপকৃত হয় এবং কলকাতার ওপর নির্ভরশীলতা করে যায়। ফলে বর্ষবাদী ও কায়েমি হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা এটাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে দাবি করে। ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং অন্তিবিলম্বে তা এক দুর্বার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

তারা বিলাতি পণ্য বর্জন তথা বাংলাদেশি আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্তানী আন্দোলনের ডাক দেয়। বিলাতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে ত্রিটিশ মিল মালিকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে ত্রিটিশ সরকার বজাভজ রাদ করতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বজাভজের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাংলাদেশি আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্তানী কর্মকাণ্ডের ফলে ত্রিটিশ সরকার হিন্দুদের কাছে নতুন রীতি বীকার করে বজাভজ রাদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বজাভজ রাদ করা হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বজাভজ রাদের পেছনে মূল কারণ ছিল হিন্দু-মৌলবাদের চরম বিরোধিতা এবং ত্রিটিশ সরকারের ইন রাজনৈতিক কৌশল।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ ত্রিটিশ শাসনাধীন বতসোয়ানায় দুটি সম্প্রদায় বাস করত। দীর্ঘদিন একত্রে থাকার ফলে তাদের মধ্যে জাতিগত হিংসা বিহুরে প্রবল আকার ধারণ করেন। তাদের একত্রে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ঐ রাষ্ট্রের জনপ্রিয় নেতৃ সোলায়মান ব্যতি তাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ দাবির প্রেক্ষিতে দেশ বিদেশি শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

/প্রশ্ন ফজলিজুল্লাহ সরকারি মহিলা কলেজ, পোগালগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১।

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে করেন?

২. ভারতবর্ষের দুটি জাতি সম্পর্কিত মতবাদটি ব্যাখ্যা করো।

৩. সোলায়মান ব্যতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তোমার পঠিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করো।

৪. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রস্তাবটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ত্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কর্নওয়ালিস জারি করেন।

খ. ভারতবর্ষের দুটি জাতি সম্পর্কিত মতবাদটি হলো হিং-জাতি তত্ত্ব।

১৯৪০ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিং-জাতি তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং, জাতীয়তার দিক থেকেও তারা আলাদা। এটিই হিংজাতি তত্ত্বের ভিত্তি।

গ. সূজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রস্তাবটি অর্থাৎ হিং-জাতি তত্ত্ব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে আমি মনে করি।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর হিং-জাতি তত্ত্ব তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজকে ব্যাপক আলোভিত করেছিল।

ছি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে লক্ষ কোটি মুসলমান রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাৱ ছিলো এ তত্ত্বের ধারাবাহিকতা। লাহোর প্রস্তাৱ ছি-জাতি তত্ত্বের ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। এই ফলৰূপ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বীপকে ইতিবৃত্ত প্রস্তাৱটি অর্থাৎ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত প্রস্তাৱ ছি-জাতি তত্ত্বের প্রভাৱ ছিল অপৰিসীম।

প্রশ্ন ৬০ 'ক' ইউরোপ মহাদেশের একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র। ধৰ্মীয় ও ভূ-খণ্ডগত বিশালতার কারণে দেশটির 'গ' প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি অংশ 'গ্রীক সাইপ্রাস' ও অন্যটি 'তুরস্ক সাইপ্রাস', নামে পরিচিত। 'ক' দেশের এ বিভক্তিৰ নিয়ে দু অংশের মধ্যে জাতিগত সংঘাত চৰম আকার ধাৰণ কৰে। এতে অনেক লোকেৱ প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদেৱ ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অবশেষে একটি সম্প্রদায়েৱ আন্দোলনেৱ কারণে সরকাৰ ২০০৮ সালে প্রদেশটি পুনঃএকত্ৰীকৰণে বাধ্য হয়। /তৃণ্যাল সৱকাৰি কলেজ, হৰিপুৰ/ গ্রন্থ নং ১/

- ক. 'ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' কত সালে ভারতবৰ্ষে আগমন কৰে? ১
 খ. ভিটিশ আমলে মুসলমানদেৱ জন্য পৃথক নিৰ্বাচন প্ৰয়োজন ছিল কেন? ২
 গ. উদ্বীপকেৱ ঘটনার সাথে ভারতবৰ্ষেৱ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কৰো। ৩
 ঘ. তুমি কী মনে কৰ, উক্ত ঘটনাটি উপমহাদেশেৱ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্টেৱ জন্য দায়ী? মুক্তি দাও। ৪

৬০ নং প্ৰশ্নেৱ উত্তৰ

ক ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবৰ্ষে আগমন কৰে।

খ ভিটিশ শাসনামলে মুসলমানদেৱ স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথক নিৰ্বাচন ব্যবস্থাৱ প্ৰয়োজন ছিল।

এ শাসনামলে পূৰ্ববঙ্গেৱ অধিকাংশ জনগণ ছিল মুসলমান। অৰ্থ এ অঞ্চলেৱ অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়েৱ। এদেৱ অত্যাচাৰ, নিৰ্যাতন ও শোষণে মুসলমান সম্প্রদায় অতিৰিক্ত হয়ে ওঠে। এমনকি আইনসভা ও প্ৰশাসনে মুসলমানদেৱ প্ৰতিনিধি ছিল অপ্রতুল। এসব কারণে মুসলমানৱা ভিটিশ সৱকাৱেৱ কাছে পৃথক নিৰ্বাচন ব্যবস্থাৱ দাবি তুলে।

গ সূজনশীল ৫ নং এৰ 'গ' প্ৰশ্নেৱ দেখো।

ঘ উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ বজ্ঞানী উপমহাদেশেৱ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্টেৱ জন্য দায়ী।

ভিটিশ ভারতেৱ শাসনতাৱিক সংস্কাৱ ও অগ্ৰগতিৰ জন্য বজ্ঞানী একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। শাসনকাৰ্যেৱ সুবিধা, ধৰ্মীয় ও ভূ-খণ্ডগত বিশালতার কারণে সৰ্ব কাৰ্জন ১৯০৫ সালে বাংলা প্ৰেসিডেন্সিকে দুটি অংশে বিভক্ত কৰেন। এৰ ফলে মুসলমানগণ সতৃষ্টি হন। কিন্তু শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দুৱা এৰ চৰম বিৱোধিতা কৰে। ফলে দুই অংশেৱ মধ্যে জাতিগত সংঘাত শুৰু হয়। অবশেষে, শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দু সমাজেৱ আন্দোলনেৱ মুখে ১৯১১ সালে এটি বৰদ কৰা হয়। উদ্বীপকেও এমন ঘটনা লক্ষণীয়।

উদ্বীপকে 'ক' ইউরোপ মহাদেশেৱ একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র। ধৰ্মীয় ও ভূ-খণ্ডগত বিশালতার কারণে দেশটিৱ 'গ' প্রদেশকে ২ ভাগে ভাগ কৰা হয়। এৰ একটি অংশ গ্ৰীক সাইপ্রাস ও অন্যটি তুৰস্ক সাইপ্রাস নামে পরিচিত। এ বিভক্তিৰ নিয়ে দুই অংশেৱ মধ্যে জাতিগত সংঘাত চৰম আকার ধাৰণ কৰে। এতে অনেক লোকেৱ প্ৰাণহানি ঘটে এবং সম্পদেৱ ব্যাপক ক্ষতি হয়। অবশেষে একটি সম্প্রদায়েৱ আন্দোলনেৱ কারণে

সরকাৰ ২০০৮ সালে প্ৰদেশটিকে পুনৰায় একত্ৰিত কৰে। এৰকম জাতিগত সংঘাত বজ্ঞানীজনেৱ ক্ষেত্ৰেও পৰিলক্ষিত।

পৰিশেষে বলা যায়, বজ্ঞানীজন উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়েৱ মধ্যে জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি কৰেছিল।

প্ৰশ্ন ৬১ সজীব ও রাজীব দুই ভাই। সজীব তাৰ পাঠ্যবই হতে একদল বিদেশি বণিকেৱ ভারতে আগমন ও প্ৰভাৱ বিস্তাৱেৱ বিষয়ে রাজীবকে পড়ে শোনাচ্ছিল। সজীব বলল 'এৱা একদিনে এই উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তাৱ কৰেনি, বৰং এৰ পেছনে ছিল তাৰেৱ দুৰদৰ্শী ও সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তা-ভাৱনা'। রাজীব বলে, 'আমি পত্ৰিকায় পড়েছিলাম, এৱা সৰ্বপ্ৰথম সম্ভাট জাহাজীৱেৱ সময়ে ভারত বৰ্ষে আসে।'

সৱকাৰি পাইওনিয়াৰ ঘৰিলা কলেজ, কলকাতা। গ্রন্থ নং ১/ক. কত সালে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হয়?

খ. বজ্ঞানীজনেৱ প্ৰশাসনিক কাৰণ কী ছিল? বুবিয়ে লেখ।

গ. উদ্বীপকে বৰ্ণিত বণিকদেৱ কৰ্মকাণ্ড পাঠ্য বইয়েৱ আলোকে ব্যাখ্যা কৰো।

ঘ. উদ্বীপকেৱ বণিকদেৱ এদেশে আগমনেৱ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ কী ছিল? বিশেষণ কৰো।

৬১ নং প্ৰশ্নেৱ উত্তৰ

ক চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে ঘোষিত হয়।

খ বজ্ঞানীজনেৱ মূলে প্ৰশাসনিক কাৰণ ছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ।

বাংলা প্ৰেসিডেন্সিৰ আয়তন ছিল প্ৰায় ২ লক্ষ বৰ্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল প্ৰায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এ বিশাল প্ৰদেশটিকে কেন্দ্ৰ থেকে একজন গভৰ্নৰেৱ পক্ষে শাসন কৰা প্ৰায় অসম্ভব ছিল। বিশেষ কৰে পূৰ্ববঙ্গেৱ যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাকব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুনৰত। এই প্ৰশাসনিক কাৰণই ছিল বজ্ঞানীজনেৱ অন্ত্যম কাৰণ।

গ উদ্বীপকে বৰ্ণিত বণিকদেৱ কৰ্মকাণ্ডেৱ সাথে পাঠ্যবইয়েৱ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিৰ সাদৃশ্য আছে।

উদ্বীপকে সজীব তাৰ পাঠ্যবই থেকে একদল বিদেশি বণিকেৱ ভারতে আগমন ও প্ৰভাৱ বিস্তাৱেৱ বিষয়ে রাজীবকে পড়ে শোনাচ্ছিল। সে আৱাও বলে, এৱা একদিনে এই উপমহাদেশে আগমন কৰেনি, বৰং এৰ পেছনে ছিল তাৰেৱ দুৰদৰ্শী ও সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তা-ভাৱনা। রাজীব আৱাও বলে, এৱা সৰ্বপ্ৰথম সম্ভাট জাহাজীৱেৱ সময়ে ভারতবৰ্ষে আসে। অনুৰূপ ঘটনা পাঠ্যবইয়েৱ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিৰ ক্ষেত্ৰেও পৰিলক্ষিত হয়।

ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যেৱ উদ্দেশ্যে ভারতবৰ্ষে আগমন কৰলেও তাৰেৱ সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তা-ভাৱনা ছিল ভারতবৰ্ষ শাসন কৰা। মুঘল সম্ভাট জাহাজীৱেৱ আমলে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভাৰতবৰ্ষে আসে। এৱপৰ উড়িষ্যা, বালেষ্ঠ, হৱিহৱপুৰ প্ৰভৃতি স্থানে কৃষি স্থাপন কৰে। বাংলাৰ সুবাদাৰ শাহ সুজা ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য কৰার অনুমতি দেন। পৰিবৰ্তীতে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভেৱ মাধ্যমে বাংলায় ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাৰ্যকৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ১৭৬৪ সালে বৰুৱারেৱ যুদ্ধে জয়লাভেৱ মাধ্যমে কোম্পানিৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া দেশীয় রাজাগুলোৱ শাসকদেৱ সাথে বিভিন্ন চুক্তিৰ মাধ্যমে কোম্পানি ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে।

ঘ উদ্বীপকে বণিকদেৱ অর্থাৎ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিৰ এ দেশে আগমনেৱ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ ছিল ভারতবৰ্ষে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপনেৱ আড়ালে বিটিশ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা।

ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্ভাট জাহাজীৱেৱ আমলে ভাৰতবৰ্ষে আসে। এ কোম্পানিটি ভাৰতবৰ্ষে বাণিজ্য কৰাৰ জন্য বিটিশ সৱকাৱেৱ কাছে ১৫ বছৰেৱ অনুমতি পায়। বিটেনেৱ রানি স্বয়ং এ কোম্পানিৰ একজন অংশীদাৰ হন। এটি ভাৰতবৰ্ষে বিভিন্ন কৃষি স্থাপনেৱ মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য শুৰু কৰে।

ইন্ট ইভিয়া কোম্পানি বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাছে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। পরবর্তীতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়লাভের মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানি কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৪ সালে বঙ্গারের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে কোম্পানির ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কোম্পানি বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে দেশিয় রাজ্যগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। কোম্পানির শাসন-শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠে। এসব আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখ্য ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, সিপাহি বিদ্রোহ প্রভৃতি। এসব আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করতে ১৮৫৮ সালে রানি ডিষ্ট্রিক্টোরিয়া সরাসরি ভারতের শাসনভাব প্রচলন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইন্ট ইভিয়া কোম্পানি মূলত ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করে।

প্রশ্ন ৬১ ইশা ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাস পড়ছিল। একটি আইনে সে দেখতে পেল যে উক্ত আইন স্বারা বার্মাকে ভারত থেকে পৃথক করা হয়। সেই আইনের মাধ্যমে প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইন বলে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

/স্বারা জাপুংজেস সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম/ প্রশ্ন নং ১/

- | | |
|--|---|
| ক. লাহোর প্রস্তাব কী? | ১ |
| খ. দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দাও। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ইশা যে আইন সম্পর্কে পড়ছিল তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. উক্ত আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। | ৪ |

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি সংবলিত যে প্রস্তাব পেশ করেন তাই লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকের ইশা যে আইন সম্পর্কে পড়ছিল সেটি হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতবর্ষে এক বিস্তুর্য অবস্থার সৃষ্টি করে। এ আইনের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য ১৯২৮ সালের ৩ মার্চ সাইমন কমিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু সাইমন কমিশনের সুপারিশসমূহকে ভারতবর্ষের জনগণ ভালোভাবে প্রিয় করতে পারেনি। তাই একই বছরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল নেহেরু রিপোর্ট। কিন্তু এ রিপোর্টে মুসলমানদের দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯২৯ সালে জিনাহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে চৌক দফত দাবি পেশ করলেন ভারতবর্ষের শাসনতাত্ত্বিক অচলাবস্থার নিরসনকরে। সবকিছু মিলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ হয়ে উঠল অতীব জটিল। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাবসমূহকে একত্রিত করে একটি খেতপত্র প্রকাশ করেন। পরে খেতপত্রটি পার্লামেন্টের 'যুক্ত কমিটি' স্বারা পরীক্ষিত হয়। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কমনসভায় তদনীন্তন ভারত-সচিব স্বার স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন। ২ আগস্ট ব্রিটিশ রাজের সম্মতি লাভের পর বিলটি আইনে প্রত্যাপিত হয়। এ আইন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন' নামে পরিচিত।

ঘ উক্ত আইনে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের অর্থ প্রদেশে শাসন

প্রতিষ্ঠা এবং প্রদেশের স্বাধীনতাবে কাজ করার ক্ষমতা। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতাবমুক্ত থেকে প্রদেশের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসনের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথসভা প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন প্রদান করা হলেও বাস্তবে তার কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়নি। এ আইনে প্রদেশের গভর্নর ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের প্রধান। প্রাদেশিক গভর্নর নিয়মতাত্ত্বিকভাবে শুধু প্রধান ছিলেন না, তিনি তার 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' এবং 'বিচারবৃদ্ধিমূলক ক্ষমতা'র মাধ্যমে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত অন্তর্বাস ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারতেন।

আইন প্রণয়নেও প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। গভর্নর আইনসভার বিল নাকচ করা, ফেরত পাঠানো ইত্যাদি ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এছাড়া জরুরি অবস্থায় প্রদেশে আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। গভর্নরগণ ব্রিটিশরাজ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন বলে তাদের কার্যাবলির জন্য মন্ত্রিসভার কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন ছিল অর্থহীন। এ ব্যাপারে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কোনো ক্ষমতা ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন শুধু তত্ত্বগতই ছিল বাস্তবে নয়। গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের অপরিসীম ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে উঠেন। মূলত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন ছিল অকার্যকর ও অর্থহীন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপ এবং আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে ১৯৩৫ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন ফলপ্রসূ হয়নি।

প্রশ্ন ৬২ '১৬০৩ সালে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের রাজবংশ রাজা প্রথম জ্যাকবের অধীনে একত্রিত হয়ে শত বছরের যুদ্ধের পর ১লা, মে ১৭০৭ প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি আর সাম্রাজ্যের গৌরবময়তার লোভে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে নিজেদের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয় স্কটল্যান্ডের তদনীন্তন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ধরে রাখে নিজের বিচার ব্যবস্থা, গির্জা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও নিজের মুদ্রা। ১৯১৯ সালে টনি ব্রেয়ারের সরকারের সময় এক গণভোটের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্কটল্যান্ড পৃথক পার্লামেন্ট চালু করে, যেখানে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

/জালজাজ মন্ত্রুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ২/

- | | |
|---|---|
| ক. বজ্রভঙ্গা রদ হয় কত সালে? | ১ |
| খ. ভারতবর্ষে মুসলমানগণ স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের সাথে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. স্কটল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট চালু করার প্রয়োজনীয়তা ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর আলোকে বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বজ্রভঙ্গা রদ হয় ১৯১১ সালে।

খ পৃথক জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে এবং পৃথক আবাসভূমির দাবিতে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল এবং তারা তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছিল। মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সচেতন করতে এবং তাদের পৃথক আবাসভূমির দাবিকে বেগবান করতে মোহাম্মদ আলী জিনাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রবর্তন করেন এবং এর ভিত্তিতে লাহোর প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছিল। এর ফলশুত্তিতেই ভারতবর্ষে মুসলমানগণ স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে।

৫. উদ্বীপকের প্রেক্ষাপটের সাথে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্য হলো দীর্ঘ সময়ের ব্রিটিশ শাসনের অবসান।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন পাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৬ সালের মত্তিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আবার কংগ্রেসে ও মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেও চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলশুতিতে মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা মোতাবেক ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করে। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি পৃথক জোমিনিয়নের সৃষ্টি হয়।

উদ্বীপকের ঘটনাতেও একই বিষয় ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্কটল্যান্ডও এবুপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে যায়। নিজেদের সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ সম্ভাটের কাছে বিকিয়ে দিয়ে তারা শত বছরের যুদ্ধের ডয়াবহতা থেকে রক্ষা পায়। স্কটল্যান্ডের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে যেভাবে শত বছরের যুদ্ধের অবসান হয় তেমনিভাবে ভারত স্বাধীনতা আইন পাসের মাধ্যমেও ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এদিক দিয়েই উক্ত দুই প্রেক্ষাপটের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৬. ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ মোতাবেক উদ্বীপকে আলোচ্য স্কটল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট চালু করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই পার্লামেন্ট তথা আইনসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনেও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ আইনের মাধ্যমেই বিনা রক্তপাত এবং সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাড়াই ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্তর হয়। যেকোনো স্বাধীন রাষ্ট্রেই আইনসভা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাই ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন মোতাবেক গণপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রত্যেক গণপরিষদের আলাদা আলাদা সংবিধান রচনার শর্তও এতে রাখা হয়। সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ দুটি উক্ত দুই রাষ্ট্রের আইনসভা হিসেবে কাজ করে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে পৃথক পার্লামেন্টের গুরুত্বের কথা অনুধাবন করা হয়েছিল বিধায় এবুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উদ্বীপকে আলোচ্য স্কটল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট চালু করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অন্তর্মেয়। স্কটল্যান্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১৯১৯ সালে টনি রেয়ারের সরকারের সময় গণভোটের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্কটল্যান্ড পৃথক পার্লামেন্ট চালু করে। আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে পার্লামেন্ট থাকা আবশ্যিক। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনেও এ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছিল যা উদ্বীপকের ঘটনাতেও প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন ৬৪. খুলনা কলেজের পৌরনীতির শিক্ষিকা রিমা চৌধুরী। তাঁর পৌরনীতি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ১৯০৫ সালে সংঘটিত বজ্ঞানভোগের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে পাঠদান শেষে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে বজ্ঞানভোগের ফলে কারা বেশি উপকৃত হয়? এক শিক্ষার্থী উত্তর দেয়, মুসলিম সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ শাসনকচক্র।

প্রশ্ন ৬৪ সংক্ষিপ্ত সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১/

- ক. বজ্ঞানভোগের কথন হয়? ১
খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে চালু করে? ২
গ. উদ্বীপকে শিক্ষিকার পাঠদানকৃত বজ্ঞানভোগের কারণগুলো কী হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্বীপকে বজ্ঞানভোগের ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯০৫ সালে বজ্ঞানভোগের কথন হয়।

খ. লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি স্থায়ী চুক্তি। এর ফলস্বরূপ কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

গ. উদ্বীপকে শিক্ষিকার পাঠদানকৃত বজ্ঞানভোগের বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

এর মধ্যে অন্যতম হল প্রশাসনিক কারণ। কেননা বাংলার আয়তন ছিল প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা বুরুহ ছিল। এজন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বজ্ঞানভোগ করা হয়েছিল।

প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ভাবলেন যে, বড় প্রদেশে বিভক্ত করা হলে বাংলাদেশের গ্রাম্যবন্দুর হওয়ার প্রচেষ্টা নস্যাংৎ করা সম্ভব হবে এবং হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও বিনষ্ট করা হবে। এ আশায় তিনি বজ্ঞান প্রদেশকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু সমাজ সচেতন হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করে বজ্ঞানভোগের চেষ্টা করে। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আদায়ের সমস্যার কথা উল্লেখ করেও বজ্ঞানভোগ করা হয়।

ঘ. সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ৬৫. একটি বড় আয়তনের দেশে কয়েকটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আলাদা আলাদা অঞ্চলে পূর্বপুরুষ থেকে বসবাস করে। সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে তারা মাঝে মধ্যে স্বল্প-সংঘাতে লিপ্ত হয়। দেশটির শাসক বিভেদনীতির মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে শাস্তি স্থাপনের প্রত্যাশায় জনাব আরিফ কিছু কিছু অঞ্চল নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাজ্য গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রশ্ন ৬৫ সংক্ষিপ্ত সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১/

ক. কোন আইনে বজ্ঞানভোগের কারণে পৃথক করা হয়? ১

খ. বৈতান শাসন বলতে কী বুবা? ২

গ. জনাব আরিফের প্রস্তাব যে প্রতিহাসিক প্রস্তাবকে ইঙ্গিত করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩

ঘ. ভূমি কি মনে কর যে উক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বজ্ঞানভোগের কারণে পৃথক করা হয়েছিল করা হয়।

খ. ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার শাসনভাবের সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো বৈতান শাসন।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের (রাজনৈতিক আদায়ের ক্ষমতা) পর লর্ড হ্যাইড বাংলায় বৈতান শাসন প্রবর্তন করেন। বৈতান শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শাস্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নামনাম নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজনৈতিক আদায়, দেওয়ানি ও জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার ইত্যাদি লাভজনক কাজ কোম্পানি নিজের হাতে রাখে। বলা হয়, বৈতান শাসন ব্যবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

ঘ. সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রথম অধ্যায়: ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ

★★ উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন

১. সিপাহি বিদ্রোহ করে সালে সংঘটিত হয়? |জ্ঞান|

- (ক) ১৮৫৭ সালে (খ) ১৮৬০ সালে

- (গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ১৮৮৫ সালে

২. ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন দেশের বণিক সংঘ? |জ্ঞান|

- (ক) ফ্রান্স (খ) ইংল্যান্ড

- (গ) পৰ্তুগাল (ঘ) ইংল্যান্ড

৩. করে সালে বঙ্গারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? |জ্ঞান|

- (ক) ১৭৬৩ সালে (খ) ১৭৬৪ সালে

- (গ) ১৭৬৫ সালে (ঘ) ১৭৬৬ সালে

৪. ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি করে সালে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করে? |জ্ঞান|

- (ক) ১৬০০ সালে (খ) ১৬০১ সালে

- (গ) ১৭৫৭ সালে (ঘ) ১৮৫৭ সালে

৫. সিরাজউল্লো করে সালে বাংলার নবাব হন? |জ্ঞান|

- (ক) ১৭৫২ (খ) ১৭৫৩

- (গ) ১৭৫৬ সালে (ঘ) ১৭৫৭ সালে

৬. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় করে সালে? |জ্ঞান|

- (ক) ১৭৫৭ সালে (খ) ১৭৫৮ সালে

- (গ) ১৯০৫ সালে (ঘ) ১৯৪৭ সালে

৭. করে সালে চিরস্থায়ী বন্দেৰন্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়? |জ্ঞান|

- (ক) ১৭৫৭ (খ) ১৭৬৫

- (গ) ১৭৮৫ (ঘ) ১৭৯৩

৮. 'Divide and Rule' নীতি কোন শাসকদের নীতিকে নির্দেশ করে? |জ্ঞান|

- (ক) পৰ্তুগীজ শাসক (খ) ভারত শাসক

- (গ) ফরাসি শাসক (ঘ) ইংরেজ শাসক

৯. ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন? |জ্ঞান|

- (ক) লর্ড কর্নওয়ালিশ (খ) লর্ড বেল্টিক

- (গ) লর্ড হার্ডি (ঘ) লর্ড ক্লাইভ

১০. কোন ইংরেজ শাসক দুই মেয়াদে বাংলার গভর্নর হয়েছিল? |অনুধাবন|

- (ক) হেনরি ডেনিসিটার্ট (খ) রজাৰ ডেক

- (গ) জন কাটিয়ার (ঘ) রবার্ট ক্লাইভ

১১. কোন চুক্তির বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিউয়ানি সনদ' লাভ করে? |জ্ঞান|

- (ক) এলাহাবাদ চুক্তি (খ) মারী চুক্তি

- (গ) পুনা চুক্তি (ঘ) আলীনগঠ চুক্তি

১২. ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গ সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যগণ যে সিদ্ধান্তে পৌছায়— |অনুধাবন|

- (ক) ১৯০৫ সালে সংঘটিত বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন

- (খ) একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠন

- (গ) মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) ১. ৩ ॥ (খ) ১. ৩ ॥

৩. ১. ৩ ॥ ১. ৩ ॥

১৩. মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি সনদ' লাভ করায়— |অনুধাবন|

- (ক) বাংলার নবাব ক্ষমতাহীন দায়িত্ব পালন করত

- (খ) কোম্পানি সরাসরি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়

- (গ) কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) ১. ৩ ॥ (খ) ১. ৩ ॥

- (গ) ১. ৩ ॥ (ঘ) ১. ৩ ॥

৪. ১. ৩ ॥ ১. ৩ ॥

★★ ভারতীয় কাউন্সিল আইন-১৮৬১

১৪. ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ অনুসারে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ করে জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল? |জ্ঞান|

- (ক) তিন জন (খ) চার জন

- (গ) পাঁচ জন (ঘ) ছয় জন

১৫. কোন আইন ভারা বাংলা অঞ্চলকে প্রদেশ হিসেবে বীকৃতি দেওয়া হয়? |জ্ঞান|

- (ক) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯৩৯

- (খ) ভারত শাসন আইন, ১৯১৯

- (গ) ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১

- (ঘ) ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

১৬. ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে ভারতে কোন ব্যবস্থার জন্য হয়? |জ্ঞান|

- (ক) প্রগতিশীল (খ) প্রতিনিধিত্বশীল

- (গ) হাবীনতাকামী (ঘ) শাসনতাত্ত্বিক

১৭. ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে মনোনয়ন পেতেন— |অনুধাবন|

- (ক) ভারতীয় যুবরাজ

- (খ) বিপুল সম্পত্তির মালিক

- (গ) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) ১. ৩ ॥ (খ) ১. ৩ ॥

- (গ) ১. ৩ ॥ (ঘ) ১. ৩ ॥

৫. ১. ৩ ॥ ১. ৩ ॥

★ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৯২

১৮. কোন আইন ভারা ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো নির্বাচননীতি গৃহীত হয়? |জ্ঞান|

- (ক) ১৮৯৩ সালের চিরস্থায়ী আইন

- (খ) ১৮৫৭ সালের ভারত শাসন আইন

- (গ) ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন

- (ঘ) ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন

১৯. ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট করে ভাগ বেসরকারি সদস্য হতো? |জ্ঞান|

- (ক) ৩ ভাগের ২ ভাগ (খ) ৪ ভাগের ২ ভাগ

- (গ) ৫ ভাগের ২ ভাগ (ঘ) ৬ ভাগের ২ ভাগ

২০. ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যগণ যে সিদ্ধান্তে পেত? |জ্ঞান|

- (ক) অধিনেতৃত্ব বিষয়ে (খ) রাজনৈতিক বিষয়ে

- (গ) জনস্বার্থ বিষয়ে (ঘ) প্রশাসনিক বিষয়ে

৬. ১. ৩ ॥ ১. ৩ ॥

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) ১. ৩ ॥ (খ) ১. ৩ ॥

২১. ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী প্রাদেশিক আইনের সদস্যগণ কোন বিষয়ক প্রশ্ন সরকারকে করতে পারত? [জ্ঞান] ১
- ক) জনস্বার্থ বিষয়ক খ) অর্থনৈতিক বিষয়ক
গ) ইলবাট বিল বিষয়ক
ঘ) রাজনৈতিক বিষয়ক
২২. ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইনকে বলা হয়—
[অনুধারন] ১
- i. উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক
ii. প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপ
iii. সংসদীয় সরকারের ভিত্তিস্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ★★ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস— ১৮৮৫ ১
২৩. ভারতীয় হিন্দু জনগণের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেনা সৃষ্টিতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? [জ্ঞান]
- ক) বিপিনচন্দ্র পাল খ) অরবিন্দ ঘোষ
গ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
ঘ) রাসবিহারী বসু
২৪. 'ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যাই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।' এখানে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? [অনুধারন] ১
- ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
খ) মুসলিম লীগ
গ) কৃষক প্রজা আন্দোলন
ঘ) মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন
২৫. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১
- ক) আলান অস্ট্রিভিয়ান হিউজ
খ) মহারাজা শান্তী
গ) জওহর লাল নেহেরু
ঘ) লর্ড ভার্ফরিন
২৬. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়— [অনুধারন] ১
- i. ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর
ii. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়
iii. বোমাই শহরে
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ★★ বঙ্গভঙ্গ— ১৯০৫ ১
২৭. বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয় কত সালে? [জ্ঞান] ১
- ক) ১৯০৩ সালে খ) ১৯০৫ সালে
গ) ১৯০৯ সালে ঘ) ১৯১১ সালে
২৮. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন কে? [জ্ঞান] ১
- ক) লর্ড কর্ণওয়ালিশ খ) লর্ড কার্তনি
গ) লর্ড চেমসফোর্ড ঘ) লর্ড রোডিং
২৯. নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী ১
- স্থাপিত হয় কোথায়? [জ্ঞান]
- ক) মুশিদাবাদে খ) কলকাতায়
গ) ঢাকায় ঘ) চট্টগ্রাম
৩০. বঙ্গভঙ্গের পর লর্ড কার্তন ঢাকাকে কী হিসেবে চিহ্নিত করেন? [অনুধারন] ১
- ক) শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রিকস্থ
খ) প্রাইটেন নগরী
গ) উদ্দীয়মান রাজধানী
ঘ) পরিষ্কৃত নগরী
৩১. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ কোনটি? ১
- ক) কে কে ১৫
খ) রাজনৈতিক গ) প্রশাসনিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) বর্মীয়
৩২. বঙ্গভঙ্গ বন হয় কত সালে? ১
- ক) ১৯০৩ খ) ১৯০৬
গ) ১৯০৯ ঘ) ১৯১১
৩৩. বঙ্গভঙ্গ বন ঘোষণার মূল কারণ কোনটি? ১
- [অনুধারন]
- ক) বঙ্গভঙ্গের বিদ্যুৎে তেমন আন্দোলন
খ) মুসলিমদের দুর্দল রাজনীতি
গ) হিন্দুদের সাথে জড়িত প্রতিশ্রুত ভাব
ঘ) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতি স্থাপন
৩৪. বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন হিসেবে যৌক্তিক হলো— ১
- ক) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতি উত্তী
খ) প্রতিশ্রুতের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির
বিজয়
গ) মুসলিম লীগের জন্য
ঘ) নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৩৫. বঙ্গভঙ্গের বিবুদ্ধে আন্দোলনের অংশ ছিল— ১
- [অনুধারন]
- i. হৃদেশি আন্দোলন
ii. বিলাতি দ্রুবা বর্জন
iii. কংগ্রেসের সমর্থন
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- নিচের উকীলকর্তি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মালেক স্যার তার শিক্ষার্থীদের বলেন, বাংলাতেও প্রতিশ্রুতিযোধী আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে যখন বিভিন্ন সংগঠন পড়ে ওঠে। তেমনিভাবে ১৯০৫ সালে সংঘটিত ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সকল ভরের মানুষকে ক্রমেই রাজনৈতিকভাবে সংযোগ করেছিল।
৩৬. উকীলকে উল্লিখিত সংঘটিত ঘটনা বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? [অযোগ্য] ১
- ক) সিপাহি বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ
গ) বঙ্গভঙ্গ ঘ) কংগ্রেস

৩৭. উদ্বীপকে উল্লিখিত বিষয়ের তাৎপর্য—[উচ্চতর নথিতা]

- i. ত্রিটিশ উচ্ছেদ আন্দোলন সংগঠিত করা
- ii. পাকিস্তান রাষ্ট্র বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়
- iii. বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়তা অর্জন করে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i, ii, iii
- খ) ii, iii
- গ) i, ii
- ঘ) i, ii, iii

গ

নিচের উদ্বীপকটি পড়ে ৪৮-৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাম্বাইল উপজেলার বেতাপুরে ইউনিয়নটির আয়তন ২০ বর্গ কিমি যা অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। তাছাড়া ইউনিয়নটির পূর্বাঞ্চল ছিল নদী অধ্যুষিত। ফলে নিরাপত্তা রক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল নিম্নমানের। তাই উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল হোসেন ইউনিয়নটিকে ভেঙ্গে দুটি ইউনিয়নে পরিণত করার পরামর্শ দেন জেলা প্রশাসককে।

৩৮. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের সাথে ত্রিটিশ ভারতের কোন প্রশাসকের মিল রয়েছে? [প্রযোগ]

- ক) লর্ড ব্যামফিল্ড ফুলার
- খ) লর্ড কার্জন
- গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
- ঘ) লর্ড রিপন

খ

৩৯. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইউনিয়নের সাথে ত্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশটির সাদৃশ্য রয়েছে?

- [প্রযোগ]
- ক) মাদ্রাজ
 - খ) উত্তরাঞ্চল
 - গ) বাহ্লা প্রেসিডেন্সি
 - ঘ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

গ

৪০. অনুচ্ছেদে বঙ্গভূজের যৌক্তিকতার যে সকল বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে—[উচ্চতর নথিতা]

- i. প্রশাসনিক এলাকার বিশালায়তন
- ii. নিরাপত্তা বিধানের ঘাটতি
- iii. অনুমত যোগাযোগ ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i, ii
- খ) ii, iii
- গ) i, iii
- ঘ) i, ii, iii

ঘ

★★ মুসলিম লীগ, ১৯০৬

৪১. ভারতীয় মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনে উন্মুক্ত হয় কেন? /সি.বি. ১০/

- ক) মুসলমানরা সংঘবন্ধ হওয়ার জন্য
- খ) হত পৌরুর ফিরে পাওয়ার জন্য
- গ) মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য
- ঘ) পৃথক জাতিসত্ত্ব প্রকাশের জন্য

গ

৪২. 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]

- ক) ১৯০২ সালে
- খ) ১৯০৫ সালে
- গ) ১৯০৬ সালে
- ঘ) ১৯১১ সালে

গ

৪৩. মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাবকারী কে ছিলেন?

- [জ্ঞান]
- ক) নবাব ভিখারুল মুলক
 - খ) ফিরোজ শাহ মেহতা
 - গ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

- ঘ) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

গ

৪৪. ত্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আলাদা সংগঠনের উৎসাহ দেন কেন? [অনুধাবন]

- ক) কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীলতার জন্য
- খ) কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য
- গ) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ধ্বংস করার জন্য
- ঘ) হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য

ঘ

৪৫. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল—

[অনুধাবন]

- ক) সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা
- খ) ত্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনন্দাত্ম নিশ্চিত করা
- গ) মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উৎপন্ন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i, ii
- খ) ii, iii
- গ) i, ii, iii
- ঘ) i, ii, iii

ঘ

★ মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯

৪৬. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? /সি.বি. ১০/

- ক) ইংরেজদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
- খ) হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
- গ) মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
- ঘ) সংখ্যালঘুদের নির্বাচন

গ

৪৭. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কত সালে পাস হয়? [জ্ঞান]

- ক) ১৮৮৫ সালে
- খ) ১৯০৯ সালে
- গ) ১৯১৯ সালে
- ঘ) ১৯৩৫ সালে

ঘ

৪৮. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন করা হয়?

[জ্ঞান]

- ক) ৬০ জন
- খ) ৬৫ জন
- গ) ৬৯ জন
- ঘ) ৭২ জন

গ

৪৯. ভারতকে স্বায়ত্ত্বাসন দানের প্রতি ত্রিটিশদের উদ্বীপ্তি করেছিল কোনটি? [অনুধাবন]

- ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি
- খ) মুসলিম লীগের রাজনীতি
- গ) ত্রিটিশদের উদারতা
- ঘ) প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা

ঘ

৫০. ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়-দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হয়? [অনুধাবন]

- ক) গভর্নর জেনারেল
- খ) ত্রিটিশ পার্লামেন্ট
- গ) ভারত সংঘ
- ঘ) ভারতীয় পার্লামেন্ট

ঘ

৫১. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ব্যর্থ হওয়ার কারণ—

[অনুধাবন]

- ক) ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি
- খ) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্নয়ন
- গ) দায়িত্বশীল সরকারের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ

ঘ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i, ii
- খ) i, iii
- গ) ii, iii
- ঘ) i, ii, iii

ঘ

নিচের উদ্ধীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: স্যার নীলরতন সরকার ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। তিনি একজন সন্তুষ্য রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তার সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ৫২ জন সদস্য ছিল। তিনি পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৫২. স্যার নীলরতন সরকার কোন কাউন্সিল আইনের বলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন? (প্রয়োগ)
 (ক) ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৬১
 (খ) ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৯২
 (গ) ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৯০৯
 (ঘ) ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৯১৯

৫৩. স্যার নীলরতন সরকারের সময়ের আইনসভার ক্ষেত্রে বলা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)
 i. সীমিত ভোটাদিকার ছিল
 ii. নির্বাচিত ও অনির্বাচিত উভয় প্রকার সদস্য ছিল
 iii. মুসলিমদের জন্য মুসলিম প্রতিনিধি ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. ও ii. (খ) ii. ও iii.
 (গ) i. ও iii. (ঘ) i., ii. ও iii.

★★ ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ বা মটেগু-
 চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

৫৪. 'বেঙ্গল প্যার্টি' কত সালে সম্পাদিত হয়? (জ্ঞান)
 (ক) ১৯১৬ সালে (খ) ১৯১৯ সালে
 (গ) ১৯২০ সালে (ঘ) ১৯২৩ সালে

৫৫. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে হস্তান্তরিত বিষয় কোনটি ছিল? (ব. কে. ১০)
 (ক) অর্থ (খ) মেচ
 (গ) শিক্ষা (ঘ) ভূমি

৫৬. ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থা ছিল—
 (ব. কে. ১০)
 (ক) প্রধানমন্ত্রীর শাসন (খ) প্রেসিডেন্সি শাসন
 (গ) গভর্নরের শাসন (ঘ) রাষ্ট্রপতির শাসন

৫৭. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ছিল কার? (প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা)
 (ক) আইন পরিষদের সদস্যদের
 (খ) নিয়বৎশের সদস্যদের
 (গ) উচ্চবৎশের সদস্যদের
 (ঘ) গভর্নর জেনারেলের

৫৮. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের সাথে জড়িত এডউইন মটেগু ও লর্ড চেমসফোর্ডের পদমর্যাদা যথাক্রমে কী ছিল? (অনুধাবন)
 (ক) ভারত সচিব, পার্লামেন্ট সদস্য
 (খ) পার্লামেন্ট সদস্য ও ভারত সচিব
 (গ) ভারত সচিব, ভাইসরয়
 (ঘ) ভাইসরয়, সিপাকার

৫৯. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন রাজকীয় সম্মতি লাভ করে কখন? (জ্ঞান)
 (ক) ২২ নভেম্বর (খ) ২৩ নভেম্বর
 (গ) ২২ ডিসেম্বর (ঘ) ২৩ ডিসেম্বর

৬০. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ছারা প্রবর্তিত 'কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া'র সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

(জ্ঞান)

- (ক) ১০ (খ) ১২
 (খ) ১৪ (ঘ) ১৬

খ

৬১. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ছারা আইনসভায় যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হলো—
 (অনুধাবন)

- i. হিন্দু-কান্তিক কেন্দ্রীয় আইনসভা
 ii. হিন্দু-কান্তিক কেন্দ্রীয় আইনসভা
 iii. প্রাদেশিক আইনসমূহের ৭০ ভাগ সদস্য ছিল
 নির্বাচিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. ও ii. (খ) ii. ও iii.
 (গ) i. ও iii. (ঘ) i., ii. ও iii.

খ

- নিচের উদ্ধীপকটি পড়ে ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। যেকোনো অজুহাতে এই অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি লেগে থাকে। এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পরিত্যাগের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি একটি চুক্তি সম্পাদন করে। (ব. কে. ১০)

৬২. উদ্ধীপকের 'ক' অঞ্চলে কোন চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

- (ক) লংগৌ চুক্তি (খ) বেঙ্গলপ্যার্টি
 (খ) পুনাচুক্তি (ঘ) সিমলা চুক্তি

খ

৬৩. এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক—

- i. হায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা
 ii. ধর্মতত্ত্বিক সমাজ প্রতিষ্ঠা
 iii. সামৃদ্ধায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i. ও ii. (খ) i. ও iii.
 (খ) ii. ও iii. (ঘ) i., ii. ও iii.

খ

★ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

৬৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিশেষ দিক কোনটি? (জ্ঞান)

- (ক) যুক্তি নির্বাচন (খ) যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা
 (খ) স্বায়ত্তশাসন (ঘ) ভারত বিভক্তি

খ

৬৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনের সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করা হয়? (জ্ঞান)

- (ক) ত্রিতীয় পার্লামেন্টের ওপর
 (খ) কেরালানির ওপর
 (গ) ভারতীয়দের ওপর
 (ঘ) কংগ্রেসের ওপর

ক

৬৬. মনে কর তৃতীয় ত্রিতীয় ভারতে রয়েছে। ভারতের সাথে ফ্রাসের একটি চুক্তি হচ্ছে। চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো কে নিয়ন্ত্রণ করছে? (প্রয়োগ)

- (ক) মন্ত্রিপরিষদ (খ) গভর্নর জেনারেল
 (খ) ভারত সচিব (ঘ) ভারতীয় জমিদার

খ

৬৭. ভারত শাসন আইনে ভারতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী
রহিত করার সাথে কোনটি জড়িত? [অনুধাবন]

- (ক) ভারত সচিব (খ) রাজপ্রতিনিধি
(গ) উপদেষ্টা সংখ্যা (ঘ) ভারতীয় প্রতিনিধি

গ

৬৮. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে
ত্রিটিশনা প্রশমিত করতে চেয়েছিল— [অনুধাবন]

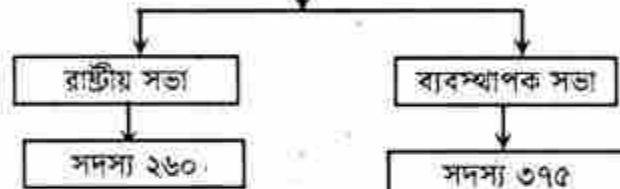
- i. ত্রিটিশনের প্রতি ভারতীয়দের অসন্তোষ
ii. ত্রিটিশনের প্রতি ভারতীয়দের ক্ষেত্র
iii. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দূরত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের ছক্তি দেখ এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ছিক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা



(দ) কে, (খ) কে ১০/

৬৯. উন্নীপকে কোন আইনটির সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি
উপস্থাপন করা হয়েছে?

- (ক) ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন
(খ) ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন
(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
(ঘ) ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন

গ

৭০. উন্নীপকে যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তাৰ
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—

- i. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত
ii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
iii. কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

ঘ

★ প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬

৭১. অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন কত
সালে অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]

- (ক) ১৯৩০ সালে (খ) ১৯৩৫ সালে
(গ) ১৯৩৭ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে

গ

৭২. অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক আইনসভা

নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত
সালে? [জ্ঞান]

- (ক) ১৯২৯ (খ) ১৯৩২
(গ) ১৯৩৫ (ঘ) ১৯৩৭

ঘ

৭৩. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা নির্ধারিত
প্রাদেশিক নির্বাচন হয় কত সালে? [অনুধাবন]

- (ক) ১৯৩৫ সালে (খ) ১৯৩৬ সালে
(গ) ১৯৩৭ সালে (ঘ) ১৯৩৮ সালে

গ

৭৪. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোনটি কঠুন্দের ব্যক্তিক্রমী
অর্জন? [অনুধাবন]

- (ক) ৫টি মুসলিম আসন (খ) ৭টি ত্রিটিশ আসন
(গ) ১১টি হিন্দু আসন (ঘ) ৭টি মুসলিম আসন

ঘ

৭৫. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হলো— / কে ১০/

- i. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া
ii. নতুন প্রদেশ সৃষ্টি
iii. প্রদেশে নিজৰ শাসন প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

ঘ

৭৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মূল কথা হলো— / কে ১০/

- i. প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক আইনসভার
নিকট দায়ী থাকবে
ii. আইনসভা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে
iii. প্রদেশে হৈতেশাসন প্রবর্তিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

ঘ

৭৭. ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

বিপ্লবৈপন বলা যায়— [অনুধাবন]

- i. সরকার পঠনে কংগ্রেস প্রাধান্য লাভ করে
ii. মুসলিম জীগ মুসলিম আসনে প্রাধান্য বিভাগ
করে

iii. নির্বাচনে হিন্দুলীয় প্রাধান্য দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) ii, iii
(গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

ঘ

★★ জিম্বাবু প্রি-জাতি তত্ত্ব

৭৮. প্রি-জাতি তত্ত্বের প্রচার করেন কে? [জ্ঞান]

- (ক) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
(খ) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
(গ) মুহাম্মদ আলী জিম্বাবু
(ঘ) মাওলানা শওকত আলী

ঘ

৭৯. জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের ফলাফল কী?

- (ক) ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
(খ) একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
(গ) অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যাহত
(ঘ) অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠা

১

৮০. জিন্নাহর বি-জাতি তত্ত্বের মূল দিক কোনটি?

- (ক) আইনিক সুন্দর এবং ক্লেচ প্রতিক্রিয়া চাকা/
(খ) ভারতের প্রধান জাতি মুসলমান
(গ) ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের সমান
অধিকার
(ঘ) ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন করবে
(ঙ) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ
করতে হবে

১

৮১. কত সালে জিন্নাহর চৌক দফা দাবি পেশ করা
হয়? (জ্ঞান)

- (ক) ১৯২৭ সালে (খ) ১৯২৮ সালে
(গ) ১৯২৯ সালে (ঘ) ১৯৩০ সালে

১

৮২. জিন্নাহর চৌক দফায় কোন অঞ্চলকে পৃথক প্রদেশ
করার দাবি ছিল? (জ্ঞান)

- (ক) সিন্ধু (খ) বাংলা
(গ) পাঞ্জাব (ঘ) বেলুচিস্তান

১

৮৩. বি-জাতি তত্ত্বের সূচনা হয় কত সালে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৯৩৮ সালে (খ) ১৯৪০ সালে
(গ) ১৯৪১ সালে (ঘ) ১৯৪৫ সালে

১

★★ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

৮৪. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কত সালে
ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন? (জ্ঞান)

- (ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯৩৫ সালে
(গ) ১৯৪০ সালে (ঘ) ১৯৪৭ সালে

১

৮৫. ভারতে মাত্র দুটি স্লাই আছে- ত্রিটিশ ও
কংগ্রেস'- ঘোষণাটি কার? (জ্ঞান)

- (ক) মহাত্মা পান্দীর (খ) চিরগাঁও দাসের
(গ) সুভাষ বসুর (ঘ) জাওহরলাল নেহেরুর

১

৮৬. মুসলিম লীগ কত সালে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা বর্জন
করে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৯৪২ সালে (খ) ১৯৪৪ সালে
(গ) ১৯৪৫ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে

১

৮৭. মোহস্মাদ আলী জিন্নাহর 'নাজাত দিবস' ঘোষণার
কারণ কী? (অনুধাবন)

- (ক) ভারতের স্বাধীনতা লাভ
(খ) পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ
(গ) কংগ্রেসের পদত্যাগ
(ঘ) ত্রিপুরার ভারতবর্ষ ত্যাগ

১

৮৮. লাহোর প্রস্তাবের মাঝে প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত

থাকে— (অনুধাবন)

- (ক) ক্রিপস প্রস্তাব
(খ) ভারত স্বাধীনতা আইন
(গ) মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) । ও ॥ (খ) । ও ৩
(গ) ॥ ও ৩ (ঘ) ।, ২ ও ৩

১

★★ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

৮৯. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর কার নেতৃত্বে বাংলার
মন্ত্রিসভা গঠিত হয়? (জ্ঞান) / সরকারি প্রতীক সেকরণের মুক্তি
ক্লেচ চাকা/ সরকারি বাংলা ক্লেচ চাকা/

- (ক) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুর হক
(খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(গ) আবুল হাশেম (ঘ) চিরগাঁও

১

৯০. ক্রিপস মিশন ব্যৰ্থতায় পর্যবসিত হয় কেন?

- (অনুধাবন) / আইনিকভাবে প্রাবল্যের সুন্দর ও এসেজ বিহুত
এসএমএস প্রতিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ/

- (ক) কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করায়
(খ) মুসলিম লীগ প্রত্যপ করায়
(গ) ত্রিপুরা প্রত্যাখ্যান করায়
(ঘ) রানির অনুমোদন না পাওয়ায়

১

৯১. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা পেশ করা হয় কত সালে?

- (জ্ঞান) / স্বাধীন বীর উত্তম লে. আনন্দোয়ার গালাস ক্লেচ চাকা/

- (ক) ১৯৪৪ সালে (খ) ১৯৪৬ সালে

১

৯২. মন্ত্রিমিশনের সদস্য ছিলেন কারা? (অনুধাবন)

- (ক) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড প্যাথিক লরেস, এ.
ভি. আলেকজান্ডার
(খ) লর্ড ওয়ার্ডেল, লর্ড লিনলিথগো, লর্ড
মাউন্টব্যাটেন

১

- (গ) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, স্যার সিরিল ব্যাডফিল্ড,
এ ভি আলেকজান্ডার

- (ঘ) লর্ড প্যাথিক লরেস, এ. ভি. আলেকজান্ডার,
লর্ড ওয়ার্ডেল

১

৯৩. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- (ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
(খ) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস

১

- (গ) লর্ড প্যাথিক লরেস

- (ঘ) এ. ভি. আলেকজান্ডার

১

৯৪. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 'India wins
Freedom' গ্রন্থে কংগ্রেস সম্পর্কে কী মন্তব্য

করেছেন? (অনুবাদ)

- (ক) কংগ্রেস শুরু থেকে অখণ্ড ভারত চোয়াছিল
(খ) অখণ্ড ভারতের প্রতি কংগ্রেসের আন্তরিকতার
অভাব ছিল

১

- (গ) মুসলিম ও কংগ্রেস পরম্পর বিপরীত

- (ঘ) পাকিস্তান সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক

১

★★ স্বাধীন অর্থনৈতিক বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ,

১৯৪৭

১৫. অর্থনৈতিক বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে কোন ব্যক্তি

জড়িত? (জ্ঞান)

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী

(খ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(ঘ) আবুল মনসুর আহমেদ

১৬. 'আমি সব সময় অর্থনৈতিক বাংলা ও বৃহৎ বাংলার পক্ষপাতি' — উক্তিটি কে করেছিলেন? (জ্ঞান)

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী

(খ) চিত্তরঞ্জন দাস

(গ) কিরণ শংকর রায় (ঘ) শরতচন্দ্র বসু

১৭. 'মুক্ত বাংলা একদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে'— উক্তিটি কে করেছেন? (জ্ঞান)

(ক) যাজা নাজিমুদ্দিন (ঘ) নূরুল আমিন

(গ) জওহরলাল নেহেরু

(ঘ) মোহাম্মদ আলী জিনাহ

১৮. নবীন স্যার প্রেশিককে এমন একজন নেতৃত্ব কর্তা কলেজে, যিনি স্বাধীন বঙ্গদেশের বিরোধিতা করেন। তিনি কার কর্তা বলেছেন? (প্রয়োগ)

(ক) শরৎ বসু (খ) সুতাম চন্দ্র বসু

(গ) কিরণ শঙ্কর রায় (ঘ) শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী

★ ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

১৯. তৃতীয় পরিকল্পনা কী? (জ্ঞান)

(ক) ভারত বিভক্ত করার পরিকল্পনা

(খ) ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা

(গ) বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা

(ঘ) পাঞ্চাব প্রদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা

২০. কোন পরিকল্পনার বাস্তব রূপ ভারত স্বাধীনতা আইন? (জ্ঞান)

(ক) মন্ত্রিমণ্ডল পরিকল্পনা

(খ) ৩ জুন পরিকল্পনা

(গ) ভারত পরিকল্পনা (ঘ) ক্রিপ্স পরিকল্পনা

২১. ১৯৪৭ সালের কত তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয়দের কাছে এদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)

(ক) ২০ জানুয়ারি (খ) ১০ ফেব্রুয়ারি

(গ) ১৫ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ২০ ফেব্রুয়ারি

২২. ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল কে? (জ্ঞান)

(ক) লর্ড মিট্টো (খ) লর্ড কার্জন

(গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন (ঘ) লর্ড হার্ডিং

২৩. পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্চাব ও পূর্ব পাঞ্চাবের সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সভাপতি কে

ছিলেন? (জ্ঞান)

(ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন (ঘ) স্যার সিরিল র্যাডক্রিফ

(ক) লয়েড জর্জ

(খ) লর্ড কার্জন

(ঘ)

১০৪. ভারতের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রিক সংকট নিরসনে

কোনটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে? (অনুধাবন)

(ক) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন

(খ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

(গ) ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

(ঘ) ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান

(ঠ)

১০৫. ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল— (অনুধাবন)

(ক) ইংরেজ শাসনের অবসান

(খ) মুসলিম শাসনের পুনর্জাগরণ

(গ) ভারত বিভক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ১. ও ২. (খ) ১. ও ৩.

(গ) ২. ও ৩. (ঘ) ১. ২. ও ৩.

(ঠ)

১০৬. লালোর প্রদ্বারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে যেটি

পরিলক্ষিত হয়— (জ্ঞান)

(ক) পাকিস্তান ও ভারত সৃষ্টি

(খ) বি-জাতি তত্ত্বের সৃষ্টি

(গ) সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ১. ও ২. (খ) ১. ও ৩.

(গ) ২. ও ৩. (ঘ) ১. ২. ও ৩.

(ঠ)

নিচের অনুচ্ছেদটি পতে ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নগুলোর

উত্তর দাও।

রাজিবের দেশটি এক সময় বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত

হত। একসময় ঔপনিবেশিক সরকার একটি আইন করে

ও দৃটি রাষ্ট্রের জন্য হয়। এর একটি রাজিবের রাষ্ট্র।

(জ) অন্তর্ভুক্ত এক জনসংখ্যার প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার প্রয়োগ করে চৰকা।

১০৭. উদ্দিপকে বর্ণিত ঔপনিবেশিক সরকারের তৈরি

আইনের সাথে তোমার পঠিত কোন আইনটি

সামঞ্জস্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

(ক) ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন

(খ) ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

(ঘ) ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন

(ঠ)

১০৮. উত্তর আইনের ফলে— (উচ্চতর নম্ফতা)

(ক) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়

(খ) মুসলমানগণ আলাদা রাষ্ট্রের অধিকারী হয়

(গ) হিন্দু-মুসলিম ছন্দের অবসান হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ১. ও ২. (খ) ১. ও ৩.

(গ) ১. ও ৩. (ঘ) ১. ২. ও ৩.

(ঠ)